বৈষ্ণব সম্প্রদায়

শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব সম্প্রদায় ★ শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

[বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস, চার বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্পর্কে আলোচনা সহ]

শ্রী মনোরঞ্জন দে

প্রাপ্তিস্থান

১. আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	২. ইস্‌কন, স্বামীবাগ আশ্রম ঢাকা-১১০০
৩. শ্রী মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০	৪. ইস্‌কন ওয়ারী আশ্রম ঢাকা-১২০৩

প্রকাশক ঃ সাবিত্রী রাণী দে
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র।

বিঃ দ্রঃ এ বইয়ের বিক্রিত সমূদয় অর্থ কৃষ্ণ-সেবায় ব্যয় করা হবে। তাই একটি বই ক্রয় করে আপনিও কৃষ্ণ সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং অন্যকেও বইটি ক্রয়ে উৎসাহিত করতে পারেন।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ
ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর
কর-কমলে।

নিবেদন

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"

ভগবৎ ভক্তগণ প্রায়শ বলে থাকেন, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা হলে নাকি বোবাও কথা বলতে পারেন, পঙ্গু ব্যক্তি গিরি লংঘন করতে পারেন। পারমার্থিক জ্ঞানের জগতে আমি আসলেই একজন মূক এবং পঙ্গু ব্যক্তি। তাই বাচাল হওয়া এবং গিরি লংঘনের যোগ্যতা যে আমার নেই – সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তারপরও সনাতন ধর্মের–বিশেষত বৈষ্ণবীয় দর্শন সম্পর্কে বই লেখার প্রয়াস অতি দুঃসাহসই বলতে হয়। আর ভাবের আবেগে তাই করে ফেলেছি।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্পর্কে জানার আগ্রহ পূর্ব থেকেই ছিল। অনেকের মুখেই চারটি স্বীকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন বিবরণ তাদের কাছ থেকে জানতে পারিনি। যা শুনেছি তা অনেকটা ভাসা-ভাসা। তাই এ বিষয়ে জানার আগ্রহ নিয়ে বেশ কিছু ধর্মীয় বই অধ্যয়ণ করার পাশাপাশি কতিপয় বৈষ্ণবের সাথে আলোচনা করি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু সহায়ক ধর্মগ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আর যাঁরা উপরোক্ত বিষয়ে বই লিখতে কৃপা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তারা হলেন ঃ (১) শ্রী পাদ কৃষ্ণ কীর্ত্তন দাস ব্রহ্মচারী (২) শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী (৩) শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি দাস (৪) শ্রী সুগতিশ্বর দাস (৫) শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী (৬) শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস (৭) শ্রী পুষ্পশীলা শ্যামদাস ব্রহ্মচারী (৮) শ্রী দুর্লভ প্রেম দাস (৯) শ্রী মুকুলপদ মিত্র (১০) শ্রী সুলোচন গৌরদাস ব্রহ্মচারী (১১) শ্রী জীবন সাহা (১২) শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র পোদ্দার (১৩) ডা: শ্রী এন. সি. বোস (১৪) ডা: শ্রী বিমলা প্রসাদ দাস (১৫) শ্রী জ্যোতিশ্বর গৌড় দাস ব্রহ্মচারী এবং (১৬) শ্রী শুভ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ। তাঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকাস্থ মাধ্ব গৌড়ীয় মঠের শ্রী মধুসূদন মহারাজ, শ্রী পদ্মনাভ মহারাজ এবং শ্রী অজিত কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ এ ব্যাপারে কৃপা করেছেন। সেজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও ঢাকার সূত্রাপুর নামহট্টের সর্বশ্রী সর্বতারক দাস, সত্যেন বিশ্বাস, জয়দেব কবিরাজ, তপন রায়, গৌতম দে, কিশোর মন্ডল, শিশির মন্ডল, রনি

পোদ্দার, শিপলু সাহা, রাখাল চন্দ্র সূত্রধর, বিপ্লব সূত্রধর, বিশ্বজিত মোদক, লিটন চন্দ্র শীল, পিন্টু সূত্রধর, সুপ্রকাশ মৈত্র, কাঁকন রায়, বিজয় শংকর, মিঠুন রায়, বিপুল দেবনাথ, অসিত দাস, কালিপদ সরকার, বিমল সরকার, নির্মল সরকার, প্রণব বণিক এবং সর্ব শ্রীমতি কবিতা রাণী সূত্রধর, বিশাখা দাসী, কাকলী সূত্রধর, রত্নমালা দাসী, ঝুমুর বর্মণ, বিণীতা বর্মণ, ছায়া মাতাজী ও মায়ারাণী সাহা – এরা সবাই বইটির লেখা ও প্রকাশনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রকৃত পক্ষে এ বইটি আমার সৃষ্ট নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় পুথি-পুস্তকে বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণব মহাজনদের সম্পর্কে যে সব বিবরণ রয়েছে সেগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে একত্রিত করেছি মাত্র। তাই এ বিষয়ে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। এতে ভক্তগণ উপকৃত হলেই এই দীন-অভাজন কৃতার্থ হবে।

বৈষ্ণব-কৃপা প্রার্থী
শ্রী মনোরঞ্জন দে।

লেখকের অপরাপর বইসমূহ

১. *দ্বাদশ গোপাল ও চৌষট্টি মহান্ত।*
২. *সনাতন ধর্ম ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ।*
৩. *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।*

লেখকের পরবর্তী বই

বৈষ্ণব প্রদীপ (বৈষ্ণব ধর্মের সহস্র প্রশ্নের উত্তর)

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ এক

অধ্যায় ঃ দুই

অধ্যায় ঃ তিন

অধ্যায় ঃ চার

অধ্যায় ঃ পাঁচ

অধ্যায় ঃ ছয়

অধ্যায় ঃ এক
বৈষ্ণব ধর্মের বিবর্তন

১.১ বৈষ্ণব শব্দের অর্থ বিষ্ণু শব্দ থেকে বৈষ্ণব শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলা যায়। শ্রী বিষ্ণুর যাঁরা ভক্ত, বিষ্ণুর পাদপদ্মে যাঁরা আশ্রিত তাদেরকেই আমরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব বলে মনে করি।

বিষ্ণুর্দেবতা যস্য স বৈষ্ণবঃ এ রূপেই বৈদিক সাহিত্যে বৈষ্ণব পদ বা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পাণিনির **'সাস্য দেবতা'** – এ অর্থে বৈষ্ণব শব্দের বুৎপত্তি পাওয়া যায়। **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ** – এই ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় ঃ

"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞ স্বয়েবেনং তদ্দেবতায়া স্বেনচ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি" – অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু নিজেই স্বেচ্ছায় দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সম্বর্ধিত করেন। তাই সহজ কথায় যারা শ্রী বিষ্ণুর পাদপদ্মে আশ্রিত থেকে নিয়ত তাঁর স্মরন, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন ইত্যাদি করেন তাদেরকে বিষ্ণুর অনুগত ব্যক্তি বলে বৈষ্ণব নামে আখ্যায়িত করা যায়।

ভক্ত তার বাসনা অনুযায়ী বিষ্ণুসেবা করতে পারেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রী নারায়ণ, শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী নৃসিংহদেব এবং পূর্ণাঙ্গরূপ হিসাবে শ্রী রাধাকৃষ্ণ রয়েছেন। এজন্য দেখা যায় কেউ শ্রী নৃসিংহদেবের, কেউ শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের, কেউবা শ্রী রাম-সীতার উপাসক হন। তবে মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় মতে শ্রী রাধাকৃষ্ণ হলেন বৈষ্ণবদের পরম উপাস্য। কারণ শ্রী রাধাকৃষ্ণ হলেন শ্রী বিষ্ণুর প্রকৃত স্বরূপ। আর সব রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ।

১.২ বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ

বৈষ্ণব ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) বৈদিক যুগে বৈষ্ণব ধর্ম।

(খ) পৌরাণিক যুগে বৈষ্ণব ধর্ম।

(গ) স্বাত্ত্বত এবং পাঞ্চরাত্র মত।

(ঘ) বর্তমান যুগে বৈষ্ণব ধর্ম এবং সম্প্রদায়।

১.২.১ বৈদিক যুগে বৈষ্ণব ধর্ম

বৈদিক যুগ থেকেই শ্রীবিষ্ণু এবং বৈষ্ণব শব্দ আমরা দেখতে পাই। ঋক্‌বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ঋকের (মন্ত্রের) সাহায্যে ঋষিগণ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করতেন। অনেক সময় ভোগ এবং ঐশ্বর্য কামনায় বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানাতেন। তাঁরা আপদে-বিপদে শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করতেন। কখনো বা নিষ্কাম ভক্তিভাবে তাঁর মহিমা কীর্ত্তনে লিপ্ত হতেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ঋক্‌বেদের প্রথম মন্ডল ২২ সুক্তের (কতিপয় ঋক বা মন্ত্র নিয়ে বেদের এক একটি সুক্ত গঠিত) ১৬ থেকে ২২ ঋক্ (বেদের মন্ত্র) তৎকালীন সময়ে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার প্রভাব, প্রসার এবং প্রতিপত্তির যথেষ্ট আভাস প্রদান করে।

(১) অতো দেবা অবন্তুনো যতে বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ।

(২) ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমুলস্য পাংসুরে।

(৩) ত্রীনি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মানি ধারয়ম্।

(৪) বিষ্ণোঃ কর্মানি পশ্যতঃ যতো ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।

(৫) তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দেবীব চক্ষুরাততম্।

(৬) তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

এসব ঋকের কোনটিতে আবার বিষ্ণুর পাদপদ্মকেই পরম আরাধ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে স্বর্গের দেবতারাও (সুরয়-মানে সুরলোক বা দেবলোকের অধিবাসীগণ বুঝায়) শ্রীবিষ্ণুর পদ সবসময় অবলোকন (পশ্যন্তি) করে থাকেন। বেদের বিভিন্ন স্থানে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতার বন্দনার কথা বলা হয়েছে। এগুলো করা হয়েছে মানুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থের জন্য। কিন্তু এসব দেবতারাও তাদের ভক্তদের বা আরাধনাকারীদের অভিষ্ট পূরণের জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপর চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্ভরশীল তা অনেক স্থানেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। আবার কিছু কিছু জায়গায় এ বিষয়ে ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

বেদের কিছু ব্যাখ্যাকার বলেন যে অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে শ্রীবিষ্ণু ত্রিবিক্রম অবতারে ত্রিপাদ (তিন পদ) সঞ্চরন করেন। শ্রীল ব্যাসদেব, মহীধর, সায়নাচার্য প্রমুখের অভিমত অনুসরণ করেই তৎকালীন সমাজে শ্রী বিষ্ণুকে স্বতন্ত্র দেবতা বলে পৃথক অর্চনা-বন্দনা করা হতো। সূর্য বিষ্ণুর শক্তি বা তেজেই জ্যোতিস্মান বলে তারা

বিশ্বাস করতেন। যেমন নারায়ণের ধ্যানে স্পষ্টত জানা যায় ঃ **'ধ্যেয় সদা সাবিত্রী মন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ"** – অর্থাৎ সূর্য মন্ডলের কেন্দ্রে যে পরম শক্তি নারায়ণ বিরাজিত তাঁর ধ্যান কর।

ঋক্‌বেদের প্রথম মন্ডলের **১৫৪** সুক্তের **৫-৬** ঋকে শ্রীবিষ্ণুর বল-বিক্রমের কথাও বর্ণনা করা আছে। বিষ্ণুকে এখানে **উরুক্রম** ও **উরুগায়** বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই ত্রিপাদ সঞ্চরনের অর্ন্তভুক্ত। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু তাঁর তিন পদ দিয়ে যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যেই অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। আবার বলা হয়েছে শ্রীবিষ্ণুর ত্রিধাম মধু (মাধুর্য), পূর্ণ এবং আনন্দময়। ঐ স্থানে গোধনও রয়েছে। ঋক্ বা মন্ত্র দুটি হল নিম্নরূপ।

(১) **তদস্য প্রিয়মভি পাথো অস্যাং নয়ো দেবযবো মন্দন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বা উতে॥**

(২) **তাবাং বাস্তন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভুরি॥**

উপরোক্ত দুটি মন্ত্রে এক অর্থে গোপবেশ বিষ্ণুর মাধুর্যময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনের মাধুর্য প্রকাশ করা হয়েছে বলা যায়। শ্রীল ব্যাসদেব এক সময় সমাধিতে অবস্থানকালে শ্রীবিষ্ণুর যে মাধুর্যলীলা দর্শন করেন তারই বিস্তৃত বর্ণনা আমরা **বিষ্ণুপুরান** এবং **শ্রীমদ্ ভাগবতে** দেখতে পাই। বৈদিক যুগের বিভিন্ন ঋষিরাও মাধুর্যের উৎস প্রিয়তম ধাম গোলোকের বহুশৃঙ্গ গাভীর দর্শনে কৃতার্থ হয়েছেন। উপরোক্ত মন্ত্রে গোলোক ধাম পাওয়ার উৎকণ্ঠা এবং ব্যগ্রতা প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঋষি তৎকালীন সময়ে বৈষ্ণব নামে পরিচিত না হলেও বৈষ্ণব নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য বলা যায়।

অথর্ববেদে **বিশ্বম্ভর** নাম পাওয়া গিয়েছে (২/৩/৫) ঃ **'বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা'**। বৈষ্ণব আচার্য শ্রীমৎ রসিকানন্দন বিদ্যাভূষণ মহোদয় একে প্রাচীন গৌরমন্ত্র বলে প্রতিপন্ন (আখ্যায়িত) করেছেন। আবার ঋকবেদে (১০/১৫৫/৩) দারুব্রহ্মের অপৌরুষেয়ত্ব এবং অনাদিত্ব (যিনি অনাদির আদি) প্রকটিত হয়েছে। আবার ঋকবেদেই বলা হয়েছে ঃ **'ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।'** এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীবপাদ গোস্বামী মন্তব্য করেনঃ হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎ স্বরূপ, স্বপ্রকাশ। তাই নামের সম্যক উচ্চারণের মাহাত্ম না জেনে এবং এমনকি অতি সামান্য জেনেও যদি নামাক্ষরগুলির অভ্যাসমাত্র করি তবেই আমরা সুমতি (অর্থাৎ তোমার বিষয় সম্পর্কিত বিদ্যা অথবা ভজন রহস্য) লাভ

করতে পারবো। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর (পাঁর্ষদ/সঙ্গী) ইত্যাদি নির্বিশেষবাদীদের মতে গৌণ এবং অনিত্য। কিন্তু বেদের উপরোক্ত বিভিন্ন মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে এগুলোর নিত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলা যায়।

যর্জুবেদের মাধ্যন্দিনী শাখায় বিষ্ণুধামের নিত্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ **'যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভুরি।'** আবার এর পিপ্পলাদ শাখায় বলা হয়েছে ঃ **'যত্তৎ সুক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং, নিত্যং পদং বৈষ্ণবং হ্যামনন্তি।'** এসব শ্লোকে বিষ্ণুর ধাম নিত্য এবং সেই ধাম তাঁর ভক্তদের সবারই কাম্য– এ ধরনের কামনার কথাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। তদুপরি ঋক্‌বেদের **'অপশ্যং' গোপাম নিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম'** ইত্যাদিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলার কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এভাবে তাঁর রূপ এবং গুণও যে নিত্য তাও বেদসংহিতায় পরিলক্ষিত হয়।

এখন দেখা যাক বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিষ্ণুর গুরুত্ব কতটুকু স্বীকৃত। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও বিষ্ণুর প্রাধান্য যথেষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১/৫) বলা হয়েছে ঃ **'অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবান্নাং দীক্ষা পালৌ।** সায়নাচার্য এই মন্ত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ অগ্নিই সকল দেবতার মধ্যে প্রথম (মুখস্বরূপ), বিষ্ণুই সকল দেবতা থেকে উত্তম। এঁরাই দীক্ষাদানের অধিকারী। তাই যজ্ঞাদি বৈদিক বিষয়ে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে বিষ্ণুই যজ্ঞেশ্বর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। **শতপথ ব্রাহ্মণেও** বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মহিমা বর্ণিত ঃ **'তৎ বিষ্ণুং প্রথমং প্রাপ, স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোহভবৎ। তস্মাদাহুঃ বিষ্ণুঃ দেবতানাং শ্রেষ্ঠ ইতি (১৪/১/১/৫)।** একই ব্রাহ্মণে আবার নারায়ণ এর নামও পাওয়া যায়। অপরাপর ব্রাহ্মণগ্রন্থেও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলা যায় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রচলন সময়েও তৎকালীন ভারতবর্ষে বৈদিক বৈষ্ণবগণের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং প্রসার ছিল।

এখন বিভিন্ন উপনিষদ বিবেচনা করি এবং দেখি উপনিষদের যুগে বৈষ্ণব ধর্মের উপস্থিতি ছিল কিনা এবং থাকলেও তার গুরুত্ব কিরূপ ছিল। এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায় বেশিরভাগ উপনিষদে বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীপুত্র, হরি, নৃসিংহদেব, বাসুদেব প্রমুখের নাম এবং ক্ষেত্র বিশেষে এঁদের গুণ ও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু উদাহরণ উপনিষদ থেকে উল্লেখ করা হলো।

(১) বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু (বৃহদারন্যক ৬/৪/২১)।

(২) শং নো বিষ্ণুরব্যক্রম ঃ (তৈওরীয় ১/১/১)।

(৩) তদ্বিষ্ণো পরমং পদং (কঠ ৩/৯/২)।

(৪) তন্নো বিষ্ণো প্রচোদয়াৎ (মহানারা ৩/৬)।

(৫) স এব বিষ্ণু ঃ স প্রাণঃ (কৈবল্য)।

(৬) যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ নমো নমঃ (নৃ-সিংহ পূর্ব)।

(৭) বিষ্ণুশ্চ ভগবান দেবঃ (ব্রহ্ম বিন্দু)।

(৮) য এব বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি (নারায়ণ)।

(৯) কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায় (ছান্দোগ্য ৩/১৭/৬)।

এসব উপনিষদ ছাড়াও **গোপাল তাপনী, রামতাপনী, কৃষ্ণোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, হয়গ্রীবোপনিষৎ** এবং **গারুড় উপনিষৎ** ইত্যাদিতে বিষ্ণু এবং তাঁর উপাস্যদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। **বৃহৎ নারায়ণ উপনিষদ্**-এ আমরা হরি, বিষ্ণু এবং বাসুদেবের নাম পাই। মহোপণিষদে নারায়ণকেই পরম ব্রহ্ম বলা হয়েছে। **নারায়ণ উপনিষদে** আবার **ব্রহ্মন্যো দেবকীপুত্র** ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে শ্রীভগবানের স্বতঃ প্রকাশ, শ্রেষ্ঠত্ব, সর্বশক্তি সর্বব্যাপক অচিন্তনীয় শক্তি ইত্যাদি প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় বিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন রূপ এবং শক্তির কথা বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণনা থাকায় সে যুগেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল বলা যায়।

১.২.২ পৌরাণিক যুগে বৈষ্ণব ধর্ম

মহাভারত, রামায়ন, শ্রীমদ্‌ভাগবত সহ বিভিন্ন পুরান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৌরানিক যুগেও বৈষ্ণব ধর্ম যথেষ্ট প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছিল। মহাভারতের মোক্ষ অধ্যায়ে নারায়ণীয় নামক অন্তর-অধ্যায় রয়েছে। এসব অধ্যায়ে পৌরানিক আমলের নারায়ণ উপাসক বৈষ্ণবগণের বর্ণনা রয়েছে। শান্তিপর্বের ৩৩৫ অধ্যায়ে ১৭-১৯ নং শ্লোকে উপরিচর রাজার কাহিনীতে দেখা যায় তিনি নারায়ণের পরমভক্ত ছিলেন। তিনি সূর্যের মুখনিঃসৃত সাত্ত্বত বিধির (পরবর্তীতে এই বিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) অনুষ্ঠানে প্রথমে শ্রী নারায়নের পুঁজা-অর্চনাদি করতেন। তারপর নারায়ণের প্রসাদ দ্বারা পিতামহ (ব্রহ্মা) সহ অপরাপর দেবতাদের পুঁজা করতেন। শান্তিপর্বে (৩৩৫/২৫) বর্ণনা রয়েছে পাঞ্চরাত্রিক (পাঞ্চরাত্রিক বিধি পরবর্তী অনুচ্ছেদ আলোচিত) ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে নিবেদিত ভোগ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করতেন – অর্থাৎ তাঁরা ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

মহাভারতের এই আখ্যান পাঠ করে জানা যায় পুরাকালে সাত্বত বিধানই ছিল প্রাচীন বৈষ্ণবমত বা বৈষ্ণবধর্ম।

তৎকালীন সময়ে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ নামে সাতজন ঋষি ছিলেন। তারা সপ্তর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন। এদেরকে আবার চিত্রশিখিন্ডী বলা হতো। এরাই সাত্বতবিধির প্রবর্তক ছিলেন। রাজা উপরিচর দেব-গুরু বৃহস্পতির নিকট থেকে এই চিত্রশিখণ্ডিজদের প্রবর্তিত শাস্ত্র পাঠ করেন এবং সে অনুসারে যাগ-যজ্ঞ করতেন। ঐ সময়ের বৈষ্ণবগণ হিংস্রযজ্ঞ বর্জন করতেন-অর্থাৎ যে সব যাগযজ্ঞে পশু বলি দেয়া হতো বৈষ্ণবরা সে সব যজ্ঞতো করতেনই না উপরন্তু ঐ ধরনের যজ্ঞে কোনভাবে অংশ গ্রহণ করতেন না। **"নারায়ণ পরো ভূতা নারায়ণ-জপং জপন্"** -এই মন্ত্রে যে ধরনের ভক্তির কথা বলা হয়েছে মহাভারতের যুগে এই ভক্তিই বৈষ্ণব ধর্মের উপাসনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এটিই স্বাত্বত বিধি-স্বয়ং ভগবানই এই ধর্মের আদি উপদেষ্টা। (**মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৩৫/৩৪-৩৮**) ।

শ্রীমদ্ ভাগবতেও সাত্বত তত্ত্বের প্রকাশ সম্পর্কে পৌরাণিক ইতিহাস আছে। সাত্বত ধর্মকে শ্রীমদ্ ভাগবতে **"ভাগবত ধর্মও"** বলা হয়েছে। কারণ পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং প্রথমে ব্রহ্মার কাছে ভাগবত্ ধর্ম প্রকাশ করেন। এরপর ব্রহ্মা নারদকে, নারদ শ্রীল ব্যাসদেবকে এভাবে পরম্পরা ক্রমে এই ধর্ম চলে আসছে। (**ভাগবত ২/৯/৪২-৪৩**)। ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্দে ব্রহ্মা, রুদ্র, সনৎ কুমার প্রমুখ বারজনকে ভাগবত ধর্মবেত্তা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব থেকে প্রমাণ হয় যে প্রাচীনকাল থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম **সাত্বত ধর্ম, ভাগবত ধর্ম এবং পাঞ্চরাত্র ধর্ম** নামে অভিহিত হয়ে আসছে। সাত্বিক পুরানসমূহ (যেমন বিষ্ণুপুরান, গরুড়পুরান ইত্যাদি) পর্যালোচনা করলে এই ধর্মের বিস্তারিত জানা যায়। সুতরাং পুরানাদি সম্মত সাত্বত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম আধুনিক না হলেও অবৈদিক ছিল না বলা যায়। কিছু প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় খৃষ্টপূর্ব বহুকাল থেকেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। এরূপ উপাসনা ছিল মূলতঃ ভক্তি মার্গভিত্তিক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবকেই পরম নিয়ন্তা বিবেচনা করে তাঁর ধ্যান এবং পুঁজা-অর্চনার বিধি-বিধান প্রচলিত ছিল।

বৈষ্ণব ধর্মের বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও রয়েছে। যেমন খৃষ্টপূর্ব ১৫০ সালে লিখিত **পতঞ্জলির** মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। **Buhler** তার **Sacred Books of the East (vol XIV)** গ্রন্থে দেখান যে বৌধায়ন-সূত্রের (বৌদ্ধ ধর্ম) পূর্বেও দামোদর এবং গোবিন্দের উপাসনা জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঐ সময় ত্রিবিক্রম বামন-বিষ্ণু ও বাসুদেব বলে পুঁজিত হতেন।

এ সময়ে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পুজা হতো। এঁর উপাসনায় মানুষ মূলতঃ বিষ্ণুপাদেরই পুজা করতো। বুদ্ধের পদচিহ্নের পুজার পূর্বে গয়াধামে শ্রী বিষ্ণুপাদেরই পুঁজা হতো।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের পূর্বেও যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ছিল তার ইঙ্গিত আমরা ঋক্‌বেদেও পাই।

"অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম।
তদারভস্ব দুর্হনোত্তেন গচ্ছ পরস্তরম (ঋক্‌বেদ ১০/১৫৫/৩)।

এই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়নাচার্য যে ভাষ্য প্রদান করেন তা হল এরূপ ঃ অনাদিকাল থেকে সুদূর সিন্ধু দেশে যে অপৌরুষেয় দারুময় পুরুষোত্তমদেব সমুদ্রতটে বিরাজমান আছেন, তাঁর উপাসনা থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট বৈষ্ণবধামে গতি হয়। এই মন্ত্র থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শ্রীজগন্নাথদেবের উপাসনা অনাদিকাল থেকেই প্রাপ্ত।

১.২.৩ সাত্ত্বত এবং পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব ধর্ম-মত

সাত্ত্বত শব্দটি সৎ + বতুপ = সত্ত্বৎ শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ সত্ত্বাযুক্ত, সত্যগুণবিশিষ্ট। তাই সাত্ত্বত মতাবলম্বী বা বৈষ্ণব বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয় যারা শ্রী ভগবানের সত্যগুণসম্পন্ন বিগ্রহকে আরাধনার প্রধান বিষয় বলে মনে করেন। সাত্ত্বতগণ শ্রী ভগবানের নবব্যুহের উপাসক। এজন্য সাত্ত্বত শাস্ত্রে সঙ্কর্ষনের (শ্রী বলরাম) বিগ্রহকেও সাত্ত্বতরূপে নিরূপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ সঙ্কর্ষনকেও শ্রীকৃষ্ণ রূপেই উপচারে বর্ণনা করা হয়েছে।

স্বাত্ত্বত শাস্ত্রে/ধর্মে প্রতিপাদ্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই নবব্যুহের আদিভূত (ভাগবত ১১/১৬/৩২)। স্বয়ং ভগবানই নারদরূপে এরূপ শাস্ত্র প্রনয়ন করেছেন বলা যায়। আবার নারায়নীয় মাহাত্ম অনুসারে সাত্ত্বত শাস্ত্র প্রথমে সূর্যমুখে নিঃসৃত হয়ে সাতজন ঋষি (পূর্বে উল্লেখিত) কর্তৃক বিস্তার লাভ করেছিল এবং রাজা উপরিচর বসুর রাজত্বকাল পর্যন্ত এর ব্যবহার ছিল। শ্রী ভগবান থেকে ব্রহ্মা, মনু, ভৃগু ইত্যাদি ক্রমে এই শাস্ত্র প্রচার হলেও কিছু বৈদিক আচার্য বলেন যে এই শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ভগবানের শিষ্য ব্রহ্মাই একমাত্র জানেন। অপরাপর ঋষি এবং মহাজনগণ নিজ নিজ বাসনা অনুযায়ী এই শাস্ত্র প্রচার করেছেন।

সাত্ত্বত সিদ্ধান্ত হল এরূপ ঃ সৎ-চিৎ আনন্দ শক্তিই ভগবান। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব এবং পুরুষোত্তম। পরমাত্মা- তাঁরই বৈভব বিশেষ। নারায়ণও স্বয়ং ভগবানের প্রথম অবতার। সকল জীবই তাঁর অংশ। সাত্ত্বত ধর্ম সম্পর্কে পদ্মপুরানের

উত্তর খন্ডের ৯৯তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ঃ

(১) সত্ত্বং সত্ত্বাশ্রয়ং সত্ত্বগুণং সেবেত কেশবং।
যোহনন্যত্ত্বেন মনসা সাত্ত্বতঃ সমুদাহৃত॥

অর্থাৎ সত্যগুণের অধিকারী কেশবকে সেবা করলেই সত্যিকারের লাভ হতে পারে।

(২) বিহায় কাম্যকর্মাদীন্ ভজদেকাকিনং হরিং।
সত্যং সত্ত্বগুনোপেতো ভক্তা তং সাত্ত্বতং বিদুঃ॥

অর্থাৎ শ্রীহরিকে সেবা করলেই সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ভক্ত হওয়া সম্ভব।

(৩) মুকুন্দ-পাদ সেবায়াং তন্নাম-শ্রবনেহপি চ।
কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরে ঃ॥

অর্থাৎ শ্রী মুকুন্দের পাদসেবন, তার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনরত ভক্তরাই শ্রেষ্ঠ।

(৪) বন্দনার্চনয়োর্ভক্তিরনিশং দাস্য-সখ্যয়োঃ।
রতিরাত্মার্পনে যস্য দৃঢ়ানন্তস্য সাত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এসব ব্যাপারে যার দৃঢ় ভক্তি বা আস্থা আছে তিনিই সত্যিকারভাবে স্বাত্ত্বতঃ ধর্ম পালনকারী।

উপরোক্ত বিভিন্ন শ্লোক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাত্ত্বত মতবাদে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন রূপ (হরি, মুকুন্দ, কেশব ইত্যাদি) বিবেচনা করে অর্চন, বন্দন, স্মরণ, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ইত্যাদি উপায়ে তাঁর সেবা করার বিধান রয়েছে।

কূর্মপুরানের চতুর্থ অধ্যায়ে আদিদেব, মহাদেব, প্রজাপতি ইত্যাদি নামের বুৎপত্তি (উৎপত্তি/ উৎস) প্রদর্শন করে বিশ্বজগৎ বিষ্ণুময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কূর্মপুরাণ থেকে জানা যায় যদুবংশের সত্ত্বত রাজা এই সাত্ত্বত ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। সত্ত্বত ছিলেন অংশুর পুত্র। আবার সত্ত্বতের পুত্র সাত্ত্বত। তিনি নারদের নিকট থেকে সাত্ত্বত ধর্মের উপদেশ পেয়ে নিরন্তর শ্রীবাসুদেব-অর্চনায় রত ছিলেন ঃ

"অথাংশোঃ সত্ত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান।
স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চনান্বিত ঃ॥

এ থেকে জানা যায় নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট এই সাত্ত্বতধর্ম অতি প্রাচীন।

এই সাত্ত্বত সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং উপাসনা পদ্ধতি সবদিক থেকে উত্তম, নিষ্কাম এবং ভগবৎ ভক্তিপূর্ণ ছিল।

উত্তর খন্ডের ৯৯তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ঃ

(১) সত্ত্বং সত্ত্বাশ্রয়ং সত্ত্বগুণং সেবেত কেশবং।

যোহনন্যত্বেন মনসা সাত্ত্বতঃ সমুদাহৃত॥

অর্থাৎ সত্যগুণের অধিকারী কেশবকে সেবা করলেই সত্যিকারের লাভ হতে পারে।

(২) বিহায় কাম্যকর্মাদীন্ ভজদেকাকিনং হরিং।

সত্যং সত্ত্বগুনোপেতো ভক্তা তং সাত্ত্বতং বিদুঃ॥

অর্থাৎ শ্রীহরিকে সেবা করলেই সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ভক্ত হওয়া সম্ভব।

(৩) মুকুন্দ-পাদ সেবায়াং তন্নাম-শ্রবনেহপি চ।

কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরে ঃ॥

অর্থাৎ শ্রী মুকুন্দের পাদসেবন, তার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনরত ভক্তরাই শ্রেষ্ঠ।

(৪) বন্দনার্চনয়োর্ভক্তিরনিশং দাস্য-সখ্যয়োঃ।

রতিরাত্মার্পনে যস্য দৃঢ়ানন্তস্য সাত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এসব ব্যাপারে যার দৃঢ় ভক্তি বা আস্থা আছে তিনিই সত্যিকারভাবে স্বাত্ত্বতঃ ধর্ম পালনকারী।

উপরোক্ত বিভিন্ন শ্লোক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাত্ত্বত মতবাদে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন রূপ (হরি, মুকুন্দ, কেশব ইত্যাদি) বিবেচনা করে অর্চন, বন্দন, স্মরণ, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ইত্যাদি উপায়ে তাঁর সেবা করার বিধান রয়েছে।

কূর্মপুরানের চতুর্থ অধ্যায়ে আদিদেব, মহাদেব, প্রজাপতি ইত্যাদি নামের বুৎপত্তি (উৎপত্তি/ উৎস) প্রদর্শন করে বিশ্বজগৎ বিষ্ণুময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কূর্মপুরাণ থেকে জানা যায় যদুবংশের সত্ত্বত রাজা এই সাত্ত্বত ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। সত্ত্বত ছিলেন অংশুর পুত্র। আবার সত্ত্বতের পুত্র সাত্ত্বত। তিনি নারদের নিকট থেকে সাত্ত্বত ধর্মের উপদেশ পেয়ে নিরন্তর শ্রীবাসুদেব-অর্চনায় রত ছিলেন ঃ

"অথাংশোঃ সত্ত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান।

স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চনান্বিত ঃ॥

এ থেকে জানা যায় নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট এই সাত্ত্বতধর্ম অতি প্রাচীন।

এই সাত্ত্বত সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং উপাসনা পদ্ধতি সবদিক থেকে উত্তম, নিষ্কাম এবং ভগবৎ ভক্তিপূর্ণ ছিল।

অন্যদিকে পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব বলতে মূলতঃ ভাগবতপন্থীদেরকে বুঝানো হয়। এই মতও অতি প্রাচীন। নারদ-পঞ্চরাত্রে এই পঞ্চরাত্র শব্দের বুৎপত্তি (উৎপত্তি /উৎস) রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

'রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং।

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মণীষণঃ॥

শ্রীবাসুদেব আদি চর্তুব্যূহ, প্রেম এবং ভক্তি এই মতের প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে শ্রী ভগবান ও বাসুদেব হলেন একই তত্ত্ব। শ্রী পুরুষের (ভগবানের) নিরুপাধি অবস্থাকে বাসুদেব বলে। পঞ্চরাত্র মতে তিনিই পরমাত্মা। তিঁনি সময় বিশেষে রক্তিম, শ্যাম অথবা গৌরবর্ন ধারণ করেন। আবার কখনো হৃদয়ের অধিষ্ঠাতারূপে (পরমাত্মা) উপাসিত হন। এঁর সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই তিনভেদ রয়েছে।

১. সঙ্কর্ষণ ⟹ সমস্ত জীব এবং প্রকৃতির নিয়ামক। এঁর বর্ন সাদা, অহংকারের অধিষ্ঠাতা হয়ে উপাসিত হন। আবার জগৎ সংহারের জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধারন করেন।

২. প্রদ্যুম্ন ⟹ স্থুল কাজের উৎপত্তির জন্য সূক্ষ্ম ব্রহ্মান্ডের নিয়ামক। সৃষ্টি কাজের জন্য ব্রহ্মা, প্রজাপতি প্রমুখ এঁর অংশ রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর বর্ন কখনো শ্যাম, আবার কখনো গৌরবর্ন হয়। ইনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা বলে উপাস্য।

৩. অনিরুদ্ধ ⟹ ব্রহ্মাদির আবির্ভাব এবং সুখ সৃষ্টির জন্য স্থুল ব্রহ্মান্ডের নিয়ামক। ধর্ম, মনু, দেবতাদি এর অংশ। শ্যামবর্ন–মনের অধিষ্ঠাতা।

মহাভারতের মোক্ষধর্ম (মুক্তিপ্রদ ধর্ম) অধ্যায়ে পাঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মত অনুযায়ী জীবের মুক্তিলাভের জন্য পাচটি উপায় রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ।

(i) কায়মনোবাক্যে (শরীর, মন এবং বাক্য) সংযম ধারনপূর্বক দেব মন্দিরে গমন, প্রাতঃকালে স্তব ও প্রনামপূর্বক ভগবৎ আরাধনা।

(ii) শ্রী ভগবানের জন্য পুষ্প চয়ন এবং তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।

(iii) সর্ব উপায়ে শ্রীভগবানের সেবা করা।

(iv) শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র পাঠ, শ্রবণ এবং মনন/স্মরণ।

(v) সন্ধ্যা আহ্নিক, পুজা, ধ্যান, ধারন এবং শ্রীভগবানে চিত্ত-সমর্পন।

পাঞ্চরাত্রের মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ গীতা, ভাগবত, শান্ডিল্যসূত্র ইত্যাদিকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করেন। বর্তমানকালে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বশিষ্ঠ, পরাশর, বিশ্বমিত্র, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, সাত্ত্বত এবং নারদ পঞ্চরাত্রগুলোই সমধিক প্রসিদ্ধ বলে স্বীকৃত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের পূর্ব থেকেই পাঞ্চরাত্র নামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত ছিল।

এমনকি মহাভারতেও পঞ্চরাত্রাগম ও সাত্ত্বত বিধানের উল্লেখ আছে। এজন্য বলা যায় ব্রাহ্মণগ্রন্থাদি রচনা হওয়ার পূর্বকাল থেকেই ভারতবর্ষে সাত্ত্বত এবং পাঞ্চরাত্র ধর্ম প্রচলিত ছিল। মহাভারতের রচনাকালের পূর্বেও যে ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ এবং বাসুদেবের অর্চনা ছিল তা মহাভারত পাঠে অনায়াসে জানা যায়। রানী নাগনিকার নানাঘাট লিপিতে **'নমো সঙ্কর্ষণ বাসুদেবানং চন্দসুতানম'** পাঠ থেকে শ্রীকৃষ্ণ পুজার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শঙ্করাচার্যের অনুসারী সন্যাসী শ্রী আনন্দগিরি লিখিত **শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় গ্রন্থ** থেকে দেখা যায় তৎকালীন সময়ে ছয়টি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল।

'ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিনঃ।
বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥

শঙ্করের কতকাল পূর্বে এসব বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁর তিরোধানের পর কোন্ সম্প্রদায়ের কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তার কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। তবে ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলই বৈষ্ণববৃন্দের জন্য ধর্মের প্রচার ভূমি ছিল। এরপর প্রচার এবং প্রসারক্রমে এই ধর্ম দাক্ষিনাত্যে বিস্তার লাভ করে। গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী নদীর তীরে, দ্রাবিড় দেশে, কৃতমালা ও তাম্রপর্নী নদীর তীরে বৈষ্ণবগণের আবাসভূমি ছিল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু **ব্রহ্ম সংহিতা** এবং **কর্ণামৃত** গ্রন্থ দেখতে পান। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে বহুকাল পূর্ব থেকেই দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার ছিল। শঙ্করাচার্যের অনেক পূর্বেই বৌধায়ন, গুহদেব, দ্রামিড়াচার্য প্রমুখ আচার্য বেদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যাই প্রদান করেছিলেন।

একথা সত্য যে সময় ব্যবধানে বৈষ্ণব ধর্মের আচার-ব্যবহার এবং উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব আচার্যগণের উদ্ভব হয় এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন আচার্যগণের আবির্ভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম তাই বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন বাদ ও প্রতিবাদ এবং তর্ক নিরসনের সাথে সাথে বৈষ্ণব ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং সিদ্ধান্তের প্রবর্তনও লক্ষ্য করা যায়।

১.২.৪ বর্তমান যুগে বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায়

সাধারণ কথায় সম্প্রদায় বলতে একই আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং উপাসনার অনুসারী লোকদের সমষ্টি বুঝায়। প্রতিটি সম্প্রদায়ে শ্রী গুরুপরম্পরা

সদুপদেশ এবং শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত উপদেশ থাকে। **অমরকোষ অভিধানে** (অমরসিংহ কর্তৃক লিখিত অভিধান বিশেষ। তিনি নামলিঙ্গানুশাসন নামে এই কোষ রচনা করেন) একেই **আম্নায়** বলা হয়েছে। আদিগুরু ব্রহ্মা থেকে শিষ্যপরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা হল আম্নায়। এই আম্নায় একমাত্র সৎ সম্প্রদায়েই লভ্য। যাঁরা বেদ এবং বৈদিক পুরানাদি শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন, শাস্ত্র বাক্যে যাদের অটল বিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বাদির স্বরূপ নির্ণয়ে এবং উপাসনা বিষয়ে একমাত্র বেদ এবং বৈদিক শাস্ত্র যাদের কাছে মুখ্য (প্রধান) প্রয়াস, পরমতত্ত্বই যাদের আরাধ্য, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি– এই তিন বিষয়ে যারা একান্ত নিষ্ঠ, বৈদিক আচার্যগনের শ্রীচরনাশ্রয়কে যারা তত্ত্বজ্ঞান (পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কিত জ্ঞান) লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেন – তারাই সত্যিকার অর্থে বৈদিক সম্প্রদায়।

পদ্মপুরাণ অনুযায়ী চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় বর্তমানকালে স্বীকৃত। এতে বলা হয়েছে ঃ **"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥"** – অর্থাৎ কলিকালে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সনক নামে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবির্ভূত হবেন। এই চার সম্প্রদায়ের যে কোন একটির আশ্রয় ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধ হয় না। **"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।**

এই চার সম্প্রদায় বর্তমানকালে আচার্যদের নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে।

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রী বিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্য চতুঃসনঃ॥" (**পদ্মপুরান**)।

– অর্থাৎ শ্রী-রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র শ্রী বিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন নিম্বার্ককে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আচার্যরূপে (প্রবর্ত্তকরূপে) অঙ্গীকার বা স্বীকার করেছেন। এই চার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই বর্তমানকালে এই উপমহাদেশে দেখা যায়।

বৈদিক শাস্ত্রের ঈশ, কেন,কঠ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারন্যক, কৌষিতকী এবং শ্বেতাশ্বতর– এই বারটি প্রধান উপনিষদ প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত এবং বেদান্তিগনের কাছে সমাদৃত। প্রস্থানত্রয় বলতে এক্ষেত্রে উপনিষদ, বেদান্ত সূত্র এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাই বিবেচ্য। এগুলো যথাক্রমে শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান এবং স্মৃতি প্রস্থান নামে পরিচিত বা অভিহিত। প্রত্যেক বেদান্তি সম্প্রদায় এই প্রস্থানত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। একই ব্রহ্ম যেমন উপাসকের সাধনা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় তেমনি একই বেদান্ত ভিন্ন

ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং পান্ডিত্য কৌশলে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বা উপস্থাপন করেছেন। এজন্য দেখা যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণও স্ব স্ব মত বা দর্শনের প্রচার ও প্রসারের জন্য উপরোক্ত প্রস্থানত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য তৈরি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রী রামানুজ **শ্রীভাষ্য**, শ্রীমধ্বাচার্য **দ্বৈত ভাষ্য** (পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন) নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য **বেদান্ত পারিজাত সৌরভ**, রুদ্র সম্প্রদায়ের শ্রী বল্লভাচার্য **অনুভাষ্য** এবং মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন **শ্রী গোবিন্দভাষ্য** রচনা করেছেন।

শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও বৈষ্ণবধর্মের অভিনব সমুজ্জল সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন বলে কোন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব একে মধ্বাচার্য সম্প্রদায় থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং শ্রী গৌড়েশ্বর বা গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলে আখ্যা দেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশ এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের আবাসভূমি বলা যায়। স্বনামধন্য শ্রীল রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহোদয় তার **'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ'** গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন ঃ রামানুজ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমার্গ ভাগবত সম্প্রদায় সম্মত। মধ্বাচার্যের মতকে প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায় বলা চলে, কিন্তু তা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করতে সমর্থ হয় নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায় পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত এই উভয়মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভক্তিমার্গের অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

আমরা এই ছোট গ্রন্থে তাই উপরোক্ত চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শন পর্যালোচনার পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কেও আলোকপাত করে এর সাথে মাধ্ব সম্প্রদায়ের কোন সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে কিনা তা দেখানোর চেষ্টা করবো। গৌড়ীয় দর্শনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা প্রতিপন্ন করার বিষয়টি এই গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় ঃ দুই

শ্রী সম্প্রদায় ⇒ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ

২.১ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ কি ?

বৈদিক শাস্ত্রে পরম সত্ত্বার (absolute truth) তিনটি ধারনা রয়েছে ঃ ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ, পরমাত্মা এবং ভগবান। উপনিষদসমূহ ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ধারনার উপর সবিশেষ আলোকপাত করেছে। পক্ষান্তরে যোগ পদ্ধতি (yoga system) পরমাত্মা এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা ও পুরাণ শাস্ত্র বিশেষত শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বেদান্ত সূত্রে বলা হয়েছে ঃ **অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা** – অর্থাৎ এস আমরা পরম সত্য বা ব্রহ্মের বিষয়ে অনুসন্ধান করি। এরপর এই বেদান্তসূত্রই আবার পরম সত্যের ধারণা এভাবে দিয়েছেন ঃ **জন্মদাস্য যতঃ** -অর্থাৎ পরম সত্য হল তাই যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মতে আত্মা বা জীব এবং পরম ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন পার্থক্য বা ভেদ নেই। জীবের ব্যক্তিসত্ত্বা বলতে কিছু নেই; জীব ব্রহ্মও বটে। কেবলমাত্র মায়া দ্বারা মোহিত বা কবলিত হয়ে সে নিজকে ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। তাই এই মায়া ত্যাগ করে পরব্রহ্মে নিজেকে বিলীন করতে পারলেই জীবের মুক্তি হতে পারে বলে শঙ্কর অভিমত প্রকাশ করেন। একেই কেবলাদ্বৈতবাদ (pure non-dualism) বলে।

শঙ্করাচার্যের উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বিশেষত শ্রীরামানুজ ব্রহ্ম, জীব এবং জগৎ সম্পর্কে যে মতবাদের পুষ্টি সাধন করেন তা বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত হয়। বিশিষ্ট বলতে এক্ষেত্রে চেতন এবং অচেতন বিশিষ্ট ব্রহ্ম বুঝায়। দ্বৈত শব্দের অর্থ হল ভেদ বা পৃথক। আর অদ্বৈত বলতে অভেদ বা একত্ব বুঝায়। সুতরাং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বলতে চেতন-অচেতন বিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব নিরূপক সিদ্ধান্ত বুঝায়। আবার কেউ কেউ বলেন ব্রহ্মের দুই রূপ/ধরন রয়েছে ঃ

(১) স্থুল চেতন বিশিষ্ট ব্রহ্ম।

(২) সূক্ষ্মচেতন বিশিষ্ট ব্রহ্ম।

এই উভয় প্রকার ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব-প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নামই হল বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী পদার্থ তিন প্রকার ঃ

(i) চিৎ (জীব) (ii) অচিৎ (জড়) এবং (iii) ঈশ্বর। এই তিনটি পদার্থ ত্রিতত্ত্ব নামে পরিচিত। এর মধ্যে চিৎ হল অসংখ্য জীবাত্মা। অচিৎ বলতে জড়-জগৎ বুঝায় এবং নিখিল কল্যাণপ্রদ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি সম্পন্ন জগৎগুরু বাসুদেব হলেন ঈশ্বর। এই তিন পদার্থই পুরুষোত্তম শ্রী হরির বিভিন্ন রূপ। বিষ্ণু পুরানের **'জগৎ সর্বং শরীরং তে'** – এই উক্তিতে অনন্ত জীবজগৎ যে বাসুদেবেরই শরীর তা প্রমাণিত হয়।

উল্লেখ্য যে আচার্য শ্রী রামানুজ থেকেই শ্রী সম্প্রদায় প্রকৃত অর্থে প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করে। তবে তাঁর পূর্বেও বৌধায়ন, দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব, শঠক দমন, নাথমুনি, যামুনাচার্য, গোষ্ঠীপূর্ণ প্রমুখ প্রাচীন আচার্যগণও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সমর্থন এবং পুষ্টি সাধন করেছেন। তাই বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ শ্রী রামানুজের কল্পনা প্রসূত নয় বরং তিনি এই মতবাদ বা দর্শনকে বিভিন্ন প্রমান ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যে সব মনীষি দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শ্রী রামানুজকে অগ্রগণ্য বলা যায়।

২.২ শ্রী রামানুজ এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ (১০১৭ – ১১৩৭)

শ্রী রামানুজ দক্ষিণ ভারতের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ৯৩৮ শকাব্দের (১০১৭ খৃষ্টাব্দে) চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। মতান্তরে রামানুজ মাদ্রাজের পশ্চিমে কাঞ্চির ভূতপুরে আবির্ভূত হন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত বৈষ্ণব যামনুচার্যের শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যামুনাচার্য দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত বিখ্যাত শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এই সুবাদে একসময় শ্রীরামানুচার্য এই মন্দিরের প্রধান পুজারী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এই ধরাধামে ১২০ বছর বেচে ছিলেন এবং ১১৩৭ সালে তাঁর তিরোভাবের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে অদ্বৈতবাদ প্রচার এবং প্রসার করেছিলেন।

শ্রী রামানুজ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সপক্ষে যেসব গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে **বেদার্থ সংগ্রহ** (বেদের উপর লিখিত ভাষ্য), **শ্রীভাষ্য** (বেদান্ত সূত্রের উপর লিখিত ভাষ্য), **শ্রী গীতা ভাষ্য** (শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা বিষয়ের ভাষ্য) এবং **বেদান্ত দ্বীপ** (বেদের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা) হল প্রধান। তিনিই শ্রী সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। বাস্তবে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ খন্ডনে তিনিই সর্ব প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে তিনটি পদার্থ বিবেচনা করা হয়েছে ঃ (i) চিৎ (জীব) (ii) অচিৎ (জড়) এবং (iii) ঈশ্বর যা তত্ত্বত্রয় নামে অভিহিত। এই তত্ত্বত্রয়ের সমর্থনের জন্য রামানুজ তাঁর বিভিন্ন ভাষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অর্ন্তভুক্ত করেন।

(১) স্থুল এবং সূক্ষ্মচেতন বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব বা অভেদ।
(২) দ্বৈত এবং অদ্বৈত শ্রুতির (শ্রুতি বলতে উপনিষদ সমূহ বুঝায়) বিরোধ।
(৩) ব্রহ্মের সগুনত্ব এবং বিভূত্ব ইত্যাদির সবিশেষভাব।
(৪) ব্রহ্মের নির্গুনত্ব এবং নির্বিশেষবাদ (শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের দুটি প্রধান বিষয়) খন্ডন।
(৫) জীবের অনুত্ব (জীব অণুচৈতন্য শক্তি), ব্রহ্মস্বভাবত্ব (গুণগত দিক থেকে জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধ বুঝায়) এবং সেবকত্ব (অণুচৈতন্য হিসাবে জীব বিভুচৈতন্যরূপী ব্রহ্মের সেবক)।
(৬) জীবের আবদ্ধ থাকার কারণ অবিদ্যা (মায়া)।
(৭) জীবের মোক্ষলাভের উপায় – বিদ্যা (পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ)।
(৮) উপাসনা ভিত্তিক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং মোক্ষ সাধনতত্ত্ব (মুক্তি লাভের সাধন প্রণালী)।
(৯) মোক্ষ অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি নিরসন (ব্রহ্মের সাথে জীবাত্মার লীন বা মিশে যাওয়ার বিষয়টির নিরসন যা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে বলা হয়েছে)।
(১০) শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ খন্ডন/বাতিল করা।
(১১) অনির্বচনীয়তাবাদ খন্ডন/বাতিল করা।
(১২) জড়জগতের তুচ্ছত্ব খন্ডন এবং এর সত্যতা/বাস্তবতা স্থাপন (অর্থাৎ জড়জগৎ তুচ্ছ বা মিথ্যা নয় এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করা)।
(১৩) জীব এবং জগতের ব্রহ্ম শরীরত্ব নিরূপণ (বিস্তৃত অর্থে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম একই তা নিরূপণ)।

শ্রী রামানুজ তাঁর **শ্রীভাষ্যে** শ্রুতি (উপণিষদসমূহ বুঝায়) স্মৃতি (পুরান, গীতা, মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্র বুঝায়), যুক্তি এবং অনুভবের সাহায্যে উপরোক্ত বিষয়গুলো উত্তমরূপে পর্যালোচনা এবং মীমাংসা করে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিপাদন করেন। তাঁর প্রতিপাদনের সারাংশ নিম্নরূপ

(i) **প্রথমতঃ** ব্রহ্ম একমাত্র তত্ত্ব বা পদার্থ না হলেও তাঁর একত্বের এবং অদ্বয়ত্বের (অদ্বিতীয়) কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ অপর দুটি তত্ত্ব (পদার্থ) জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই অন্তর্গত এবং আশ্রিতরূপে সত্য। এগুলো ব্রহ্মের বাইরে নয়। এদের স্বাধীন সত্ত্বা নেই।

(ii) **দ্বিতীয়তঃ** ব্রহ্মের সজাতীয় (একই জাতীয়) এবং বিজাতীয় ভেদ বা পার্থক্য নেই। কারণ সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের বাইরে সমজাতীয় বা বিজাতীয় (ভিন্ন জাতীয়) কিছু নেই বা থাকতে পারে না।

(iii) **তৃতীয়তঃ** ব্রহ্মের স্বগতভেদ (নিজস্ব) ভেদ রয়েছে। যেমন চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (জগৎ) হল ব্রহ্মের ন্যায়ই সত্য। কিন্তু ব্রহ্মের দ্বিতীয় নয়।

(iv) **চতুর্থতঃ** ব্রহ্ম হলেন অংশী। আর জীব ও জগৎ হল অংশ। ব্রহ্ম আত্মা। জীব ও জগৎ দেহ। ব্রহ্ম সব কিছুর আধার বা আশ্রয়। জীব ও জগৎ হল আধেয় বা আশ্রিত। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে বিশিষ্ট-অর্থাৎ ধর্মত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন হলেও ব্রহ্মের আশ্রয়ী ও পৃথক সত্ত্বাহীন বলে অভিন্ন।

(v) **পঞ্চমতঃ** ব্রহ্ম, চিৎ এবং অচিৎ-অর্থাৎ ব্রহ্ম, জীব এবং জড়জগৎ এই তিনটি পদার্থ বা তত্ত্ব পৃথক সন্দেহ নেই। তবে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্মের আশ্রিত) বলে অভেদে একটিমাত্র তত্ত্বই রয়েছে – চিদৃচিদ্ বিশিষ্ট ঈশ্বর। যেমন একটি গাছের মূল, কান্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্প এই পাচটি পৃথক সত্ত্বা আছে। পৃথকভাবে চিন্তা করলে প্রতিটির পৃথক সত্ত্বা এবং গুণাগুণ রয়েছে। ভিন্ন ভিন্নভাবে বা ব্যষ্টিকভাবে (from micro point) এরা একে অন্যের থেকে পৃথক-অর্থাৎ এদের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য (difference) আছে। কিন্তু একত্রিত বা সমষ্টিগতভাবে (from macro point) গাছটি বিবেচনা করলে এই সব পৃথক বস্তু একত্ব লাভ করে-অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে আর ভেদ থাকে না। কারণ গাছটির মধ্যেই এসব অংশ অর্ন্তভুক্ত। তেমনি জীব ও জড় জগৎ এবং ব্রহ্ম এককভাবে বিবেচনা করলে এদের মধ্যে ভেদ/পার্থক্য রয়েছে মনে হবে। কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যেই জীব এবং জড়জগৎ অর্ন্তভুক্ত-এই মনে করলে তাদের আর পৃথক সত্ত্বা বিবেচনা না করলেও চলে।

শ্রী রামানুজীয় মতে ভগবান পাঁচরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

(i) অর্চাবিগ্রহ রূপে (পুজার বিগ্রহ রূপে)।
(ii) বিভবরূপে (যেমন মৎস, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি অবতার রূপে)।
(iii) চর্তুব্যুহ রূপে (বাসুদেব, সংক্কর্ষণ/বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে)।
(iv) সূক্ষ্মরূপে (যেমন বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম)।
(v) পরমাত্মা বা অর্ন্তযামী রূপে।

ভগবানের উপরোক্ত রূপের ছয়টি করে গুণ (quality) রয়েছে ঃ বিরজ, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘিৎসা (ক্ষুধা ও পিপাসা ভাব), সত্যকাম এবং সত্যকল্প। আবার তাঁর উপাসনাও পঞ্চ প্রকার।

১. অভিগমন (ইষ্টদেবের গৃহ ও পথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অনুলেপন)।
২. উপাদান সংগ্রহ (পুঁজার বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ এবং আহরণ)।
৩. ইজ্যা (সরাসরি ভগবৎ পুজা করা)।
৪. স্বাধ্যায় (অর্থ অনুধাবন বা হৃদয়ঙ্গম করে মন্ত্রজপ, বৈষ্ণব মন্ত্র ও স্তোত্রপাঠ, নাম সংকীর্ত্তন এবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ)।
৫. যোগ সাধনা (ধ্যান, ধারনা ও সমাধি)।

শ্রী রামানুজের মতে উপরোক্ত উপায়ে উপাসনা করতে পারলে জীবের বৈকুণ্ঠ লাভ হতে পারে। শ্রী রামচন্দ্র এবং শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ এই সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য।

২.৩. শ্রী সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং শাখা-প্রশাখা শ্রী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ প্রায়শঃ শ্রী রামচন্দ্র তথা শ্রী রঘুনাথের উপাসক। এই সম্প্রদায় গ্রন্থের দিক থেকে বেশ সমৃদ্ধশালী বলা যায়। শ্রী ভাষ্য, দ্রমিড়ভাষ্য, ন্যায়সিদ্ধি, সিদ্ধিত্রয়, শ্রুত প্রকাশিকা, বেদান্তবিজয়, তত্ত্বত্রয়, গীতাভাষ্য ইত্যাদি বহু গ্রন্থ এই সম্প্রদায়ে আছে।

শ্রীরামানুজের বহু শাখার মধ্যে নিম্নোক্ত শাখাগুলো বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে বলা যায়।

(i) রামানন্দী (ii) কবীরপন্থী (iii) খাকি (iv) মুলুকদাসী (v) দাদুর পন্থী (vi) রয়দাসী (vii) সেনঁপন্থী (viii) রামসনেহী ইত্যাদি।

শ্রী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ সমর্থনকারী কতিপয় বিখ্যাত বৈষ্ণব হলেন ঃ বৌধায়ন, দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব, শঠকদমন, নাথমুনি, যামুনাচার্য, গোষ্ঠীপূর্ণ, হরিয়ানন্দ, বেঙ্কটাচার্য, রাঘবানন্দ, রামানন্দ, রামদাস, শুকদেব দাস প্রমুখ।

২.৪ শঙ্করাচার্যের সাথে রামানুজের দর্শনের পার্থক্য (বিশুদ্ধ/কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মধ্যে পার্থক্য/তুলনা)

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খৃষ্টাব্দ) দক্ষিণ ভারতের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে আবির্ভূত হন। তার আবির্ভাবের সময় বৌদ্ধ ধর্ম বিপুলভাবে প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধমত বেদকে অস্বীকার করে নির্বানলাভের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। এ অবস্থায় বৈদিক ধর্ম প্রচন্ড বিরোধিতা এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। তাই বৌদ্ধ

মত খন্ডন করে বৈদিক ধর্ম এবং দর্শন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে শঙ্করাচার্য অগ্রসর হন। এই লক্ষ্যে তিনি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন যা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আচার্যগণ বিশেষত শ্রী রামানুজের কঠোর বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। তিনি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করে শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী মতের বিভিন্ন দিক খন্ডন করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মকে পুনরায় সংস্থাপন করেন। শঙ্করাচার্য এবং রামানুজের মতবাদের মধ্যে নিম্নোক্ত উপায়ে তুলনা করা যায়।

(১) **প্রথমতঃ** শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েই অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে শঙ্কর ছিলেন চিন্মাত্রবাদী। আর রামানুজ চিদ্‌চিদ বিশিষ্ট ব্রহ্মবাদী।

(২) **দ্বিতীয়তঃ** শঙ্করের মতে চিৎ-রস হল কেবলমাত্র ব্রহ্ম। আর সব পদার্থই মিথ্যা-ইন্দ্রজালের ন্যায়। রামানুজও সর্ব ব্রহ্মময় স্বীকার করেন। তবে এই ব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ রহিত হলেও স্বগত ভেদযুক্ত।

(৩) **তৃতীয়তঃ** শঙ্কর এই জগৎকে মায়া বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ঃ **'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'** শঙ্কর ব্রহ্মকে নিরাকার ও নির্গুন বলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের কোন সবিশেষ আকার নেই, তার কোন বিশেষ গুণও নেই। রামানুজ এর মতে জগৎ বাস্তব এবং ব্রহ্ম হলেন নিখিল কল্যাণ এবং কর্মগুণ বিশিষ্ট শ্রী বাসুদেবঃ **'বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণ-গুণ-সংযুতঃ। ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ।'** তাঁর মতে ধ্যান ও ভক্তি' দ্বারাই বাসুদেবকে লাভ করা যায়। তাই রামানুজের দর্শনে ব্রহ্মকে মূলতঃ ঈশ্বর বা ভগবান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলা যায়। আর এই ঈশ্বর হলেন স্বয়ং শ্রী বাসুদেব।

(৪) **চতুর্থতঃ** শঙ্কর তাঁর লেখায় **"তত্ত্বমসি"** শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই শব্দটি দ্বারা **"তুমিও সেরূপ"** বুঝায়। এ দ্বারা তিনি জীবকেই ব্রহ্মরূপে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ জীব (আত্মা) এবং ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কিন্তু রামানুজের মতে জীবাত্মা চিন্ময় সন্দেহ নেই, তবে সে সবদিক থেকে পরব্রহ্মের সমান নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে পরব্রহ্মকে একটি বিরাট জলন্ত অগ্নির সাথে তুলনা করে জীবাত্মাকে ঐ অগ্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিংগ বলে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ জীব পরব্রহ্মের আশ্রিত একটি অনুশক্তি মাত্র। বিভু বা সর্বব্যাপক শক্তি হলেন ব্রহ্ম। এজন্য রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী দর্শনে ব্রহ্ম হলেন ঈশ্বর তথা শ্রীবাসুদেব স্বয়ং।

(৫) **পঞ্চমতঃ** শঙ্করের মতে জীব মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মায়াকবলিত বলেই জীব (আত্মা) নিজের ব্রহ্ম স্বরূপ বুঝতে পারে না। জীব যখন তার এই স্বরূপ বুঝতে পারবে তখনই সে এই জড়জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারবে। তাই শঙ্কর

দর্শনে মুক্তি বলতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া বুঝায়। বৈষ্ণব আচার্যেরা একেই সাযুজ্য মুক্তি তথা ব্রহ্ম জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া বুঝান।

রামানুজের মতে প্রত্যেক জীবই চিৎ-কনা এবং ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ-সন্দেহ নেই। তবে জীব এবং ব্রহ্মের পৃথক সত্ত্বা আছে। তাই এই ভেদ চিরদিনই থাকবে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ঃ **"এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি ছিলাম না, তুমি ছিলে না বা এই রাজন্যবর্গ ছিলেন না। ভবিষ্যতেও আমাদের মধ্যে কেউ থাকবো না এমন সম্ভাবনাও নেই।"** শ্রী রামানুজের দর্শনে গীতায় উক্ত শ্রী ভগবানের এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

জীবের মুক্তি সম্পর্কে শঙ্করের বক্তব্যের সাথেও শ্রী রামানুজ দ্বিমত পোষণ করেন। শঙ্করের মুক্তি হল ব্রহ্ম কৈবল্য – অর্থাৎ পরব্রহ্মে মিশে যাওয়া বুঝায়। কিন্তু রামানুজ বলেন ভগবৎ ধামে নিত্য প্রতিষ্ঠাই মুক্তি-অর্থাৎ শ্রী বাসুদেবে জীবাত্মার আত্মসমর্পনই মুক্তির প্রকৃত উপায়। এই মুক্তি হল আনন্দের। ভগবানের সাথে জীবের বিশেষ সম্পর্ক এ থেকে প্রকাশ পায়।

(৬) **ষষ্ঠতঃ** বলা যায় শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী ছিলেন। আর রামানুজ ছিলেন পরিনামবাদী। বিবর্ত্তবাদের মূল কথা হল ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়। তাই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হতে পারেন না। হলে তার মূল সত্ত্বা আর থাকতে পারে না। যেমন একটি কাগজ খন্ডকে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় তবে সেটির আর মূল সত্ত্বা বা অস্তিত্ব থাকে না। শঙ্করের মতে অনুরূপভাবে ব্রহ্ম নিজেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিতে বিস্তৃত করতে পারেন না যদি নিজের মূল সত্ত্বা অক্ষুণ্ন রাখতে চান।

পক্ষান্তরে পরিমাণবাদ হল পরব্রহ্ম থেকে কিভাবে সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে সে সংক্রান্ত শ্রীল ব্যাসদেবের মূল দর্শন। পরিনামবাদ অনুযায়ী পরম ব্রাহ্মণ বা পরমেশ্বর ভগবান থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সব কিছুর আশ্রয়ী। আর সব হল আশ্রিত। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ব শক্তিমান। তাই তিনি সর্বভূতে বা সব ধরনের সৃষ্টিতে নিজের শক্তি বিস্তার করেও পূর্ণ শক্তিতে বিরাজ করতে পারেন। যেমন একটি বিরাট অগ্নিকুন্ড থেকে হাজার হাজার অগ্নিকণা বের হয়ে গেলেও তার স্বরূপ ঠিকই থাকে। এই অর্থেই রামানুজ পরিনামবাদী ছিলেন বলা যায়।

(৭) সবশেষে বলা যায় রামানুজ দেহ, আত্মা এবং ব্রহ্মের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন তাও শঙ্করের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন। শঙ্করের দর্শন অনুযায়ী জীব (আত্মা) এবং ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রামানুজ বলেন জীব (আত্মা) যেমন দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক তেমনি ব্রহ্ম এই জড় জগৎ এবং এর মধ্যের সব জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন। দেহ যেমন জীবের (আত্মার) জন্য একটি মাধ্যম

(medium) বা আশ্রয় তেমনি জড় ব্রহ্মান্ডও ঈশ্বরের কর্মকান্ডের জন্য একটি মাধ্যম মাত্র। দেহকে মাধ্যম বা আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করে জীব (আত্মা) বিভিন্ন ধরনের জড় জাগতিক অভিজ্ঞতা লাভ করে। আবার মুক্তির পরও জীব (আত্মা) সূক্ষ্মদেহ বা চিন্ময়দেহ ধারন করে তার পৃথক সত্ত্বা ধরে রাখতে পারে। এভাবে দেহকে আত্মা (জীব) থেকে একেবারে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। কারণ দেহ হল জীবের আশ্রয়স্থল। এই ধারনার আলোকেই শ্রীপাদ রামানুজ বলেন যে জীব ও জগৎ চূড়ান্ত পর্যালোচনায় পরব্রহ্মের অংশমাত্র।

২.৫ শ্রী সম্প্রদায়ের কতিপয় বিখ্যাত আচার্য/বৈষ্ণব

শ্রী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী দর্শন এক সময় ভারতের দাক্ষিনাত্যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। পরবর্তীতে মধ্ব-দর্শন এবং বিশেষত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দাক্ষিনাত্যে ভ্রমণের ফলে এই সম্প্রদায়ের দর্শন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তৎকালীন সময়ের শ্রী সম্প্রদায়ের অনেক বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্যের নাম বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া গেলেও তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী পাওয়া দুরুহ ব্যাপার। যে দুই-তিন-জন শ্রী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাই এই বইতে তুলে ধরা হল।

২.৫.১ শ্রীপাদ যামুনাচার্য

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সমর্থক মহামনীষি। তিনি রামানুজের পরম গুরু ছিলেন (রামানুজের গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের গুরু ছিলেন)। এঁর অন্য নাম আলবন্দার। তিনি **স্তোত্ররত্ন** নামক যে কবিতা রচনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে কতিপয় শ্লোক গৌড়ীয় গোস্বামীগণ সাদরে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি ভারতের দাক্ষিনাত্যের শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের শ্রীরঙ্গদেবের উপাসক এবং প্রধান সেবক ছিলেন।

২.৫.২ শ্রীপাদ বেঙ্কটাচার্য (বেঙ্কট ভট্ট)

শ্রী সম্প্রদায়ের শ্রুতি (উপনিষদকে শ্রুতি শাস্ত্র বলা হয়) এবং স্মৃতি (শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, ভাগবত্ম ইত্যাদি) শাস্ত্র বিশারদ অন্যতম প্রধান পন্ডিত ছিলেন শ্রীপাদ-বেঙ্কটাচার্য। আনুমানিক ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীর নিকটবর্তী এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী সন্যাসী ছিলেন এবং পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করেন।

আদর্শ চরিত্রের বলে অভূতপূর্ব পান্ডিত্য ও প্রতিভায় এবং শঙ্করাচার্যের শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের (কেবলাদ্বৈতবাদ) ভুল নিরসনে তিনি শ্রী সম্প্রদায়কে জয়শ্রী মন্ডিত করেছিলেন। তিনি রামানুজের **শ্রী ভাষ্যের** উপর **তত্ত্বটীকা** রচনা করেন।

শ্রীপাদ বেঙ্কটাচার্যের সময়েই দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিনাত্য আক্রমণ করেন। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করে নগরী এবং শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির লুট করতে থাকে। বেদান্তদেশিক বেঙ্কটাচার্য তখন শ্রীরঙ্গনাথকে শ্রী সম্প্রদায়ের একজন অতি ভক্ত শ্রী লোকাচার্যের সহায়তায় বনপথে তিরুপতি নামক স্থানে স্থানান্তর করেন এবং শ্রী সুদর্শনাচার্যের **শ্রুত প্রকাশিকা টীকা** এবং তাঁর (শ্রী সুদর্শনসুরীর অর্থাৎ সুদর্শনাচার্যের) দুই পুত্রসহ যাদবাদ্রিতে গমন করেন। পরে গোপ্পনার্থ নামক জনৈক পরাক্রমশালী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ শাসনকর্তার সহায়তায় আক্রমণকারীদেরকে দমন পূর্বক শ্রী রঙ্গনাথকে পুনরায় ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ বছরই তিনি **বৈকুণ্ঠ লাভ** (তিরোধান) করেন।

শ্রী সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে **শতদুষনী** গ্রন্থে তিনি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ দর্শনের বিরুদ্ধে শতপ্রকার দোষ দেখান। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর **সংক্ষেপ বৈষ্ণব তোষনীতে** বেঙ্কটাচার্যের এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত-এর মধ্য লীলা থেকে দেখা যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভারতের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে এক সময় শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে উপনীত হন। ঐ সময় বৈষ্ণবাচার্য **বেঙ্কট ভট্ট** তাঁকে মহাসমাদরে তার গৃহে নিয়ে যান। সেখানে মহাপ্রভু চারমাস অবস্থান করেছিলেন।

"শ্রী বৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রন কৈল করিয়া সম্মান।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণ কথারসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঁয়াইলা সুখে চারিমাসে॥"
[চৈ. চ. মধ্য ৯/৮২, ৮৬]

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অনুযায়ী বেঙ্কট ভট্ট প্রথমে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়নের উপাসক ছিলেন (শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা শ্রী রামচন্দ্রের উপাসক হন)। পরে কিন্তু মহাপ্রভুর সাথে দীর্ঘদিন আলোচনার পর তাঁর উপদেশে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের উপাসক হয়েছিলেন।

"ভট্ট কহে কাঁহা আমি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥"
[চৈ. চ. মধ্য ৯/১৫৮-১৫৯]

২.৫.৩ শ্রীপাদ রামানন্দ স্বামী প্রয়াগক্ষেত্রে (এলাহাবাদ) পুন্যসদন নামক জনৈক কাশ্যপ গোত্রীয় কান্যকুজ-ব্রাহ্মণের ঔরসে তার পত্নী সুশীলা দেবীর গর্ভে ১২২২ শকাব্দের মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রী রামদত্ত।

অধ্যয়নের লক্ষ্যে রামদত্ত কাশীতে যান। সেখানে তিনি তৎকালীন মহাপন্ডিত স্বামী রাঘবানন্দের নিকট বিদ্যালাভের মনোবাসনা ব্যক্ত করলে রাঘবানন্দ স্বামী তাকে জীবনের স্বল্পতা বিষয়ে উপদেশ দেন। এর প্রেক্ষিতে তিনি পান্ডিত্য অর্জনের স্পৃহা ত্যাগ করে স্বামী রাঘবানন্দের নিকট থেকে ষড়ক্ষর শ্রী রামমন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তখন তিনি রামানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি সন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজকরূপে বৈষ্ণব ধর্ম এবং শ্রী রাম ভক্তির কথা প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

উল্লেখ্য যে এই রাঘবানন্দ ছিলেন স্বামী হরিয়ানন্দের শিষ্য। তিনি আবার শ্রী রামানুজ থেকে গুরুপরম্পরায় একবিংশ অধস্তন। শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের পরবর্তী অধস্তনদের এক পক্ষ রাঘবানন্দকে শ্রী রামচন্দ্রের অবতার বলে কল্পনা করে এই সম্প্রদায়কে পৃথক বলে থাকেন। অপরপক্ষ কিন্তু শ্রীরামের অংশ অবতার বললেও রামানুজের অধস্তন আচার্যরূপে রামানন্দের আচার্য বা গুরু পরম্পরা দেখাইয়া থাকেন। হিন্দী ভাষায় রচিত **ভক্তমাল** গ্রন্থের রচয়িতা **শ্রী নাভাজী** এবং **শ্রী বার্ত্তিক প্রকাশকার** এই দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থনকারী ছিলেন। উল্লেখ্য যে **ভবিষ্য পুরানের** প্রতিসর্গ পর্বের ৪/৭ অধ্যায়ে শ্রীপাদ রামানন্দের জন্মকাহিনীর বর্ণনা আছে।

অধ্যায় ঃ তিন
শ্রী মাধ্ব সম্প্রদায় ⟹ শুদ্ধ দ্বৈতবাদ

৩.১ শুদ্ধ দ্বৈতবাদ কি ?

শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের (কেবলাদ্বৈতবাদ) বিপক্ষে শ্রীপাদ রামানুজের থেকে কিছুটা ভিন্ন মতবাদ শ্রী মধ্বাচার্য গড়ে তুলেন। তিনি শঙ্করের নির্বিশেষ দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর **পূর্ণপ্রজ্ঞা ভাষ্যে** যে বেদান্ত দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন তাকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বলা হয়। শুদ্ধ দ্বৈতবাদে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে ঃ পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং জড়জগৎ। এই দর্শনের মূল কথা হল পরমেশ্বর ভগবান জীব থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি সেব্য আর জীব হল তার সেবক। যিনি সেব্য (সেবার পাত্র) তিনি সেবক (যে অন্যের সেবা করেন) থেকে অবশ্যই ভিন্ন হবেন। যেমন চাকর রাজা থেকে ভিন্ন হয়।

"পরমেশ্বরো জীবাদ্ভিন্নঃ তং প্রতি সেবত্বাৎ, যে যং প্রতি সেব্যঃ স তস্মাদ্ভিন্নো যথা ভৃত্যাদ্ রাজা।" (সর্বদর্শন সংগ্রহ)।

শাণ্ডিল্য সংহিতা পরিশিষ্ট এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের সমর্থনে শ্রুতি পাওয়া যায়। এই মতবাদ অনুযায়ী পরমেশ্বর জীব এবং জড়ের (জড় জগতের বস্তুসমূহ) মধ্যে পাঁচ ধরনের ভেদ (পার্থক্য) রয়েছে।

১. প্রথমতঃ জীব (আত্মা) এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ। জীব অনুচৈতন্য আর পরমেশ্বর বিভু চৈতন্য। তাই এদের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য/ভেদ রয়েছে।

২. দ্বিতীয়তঃ জড় এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ/পার্থক্য আছে। স্মৃতি শাস্ত্রের ভিত্তিতে শুদ্ধ দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, পরমেশ্বর এই জড় জগতের উর্ধ্বে রয়েছেন। জড় জগৎ হল তার অপরা প্রকৃতি। অর্থাৎ তাঁর নিকৃষ্ট শক্তির ফলাফল হল এই জড় জগৎ। তাই জড়জগৎ এবং পরমেশ্বরের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ বা পার্থক্য আছে।

৩. তৃতীয়তঃ জীবে জীবে ভেদ বা পার্থক্য রয়েছে।

৪. চতুর্থতঃ জড় এবং জীবের পার্থক্য বা ভেদ। জীব জড় বস্তু থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক। কারণ জড় হল পরমেশ্বর ভগবানের অপরাশক্তির ফল। আর জীব (আত্মা) তাঁর পরাশক্তির (উৎকৃষ্ট শক্তি) অংশ। এজন্য জীব জড়বস্তু থেকে উন্নত।

৫. পঞ্চমতঃ জড়ে জড়ে ভেদ বা পার্থক্য-অর্থাৎ বিভিন্ন জড় বস্তু পরিমানগত এবং গুণগতভাবে একে অন্যের থেকে পৃথক।

শুদ্ধ দ্বৈতবাদ অনুযায়ী জীব জড়বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট। আবার পরমেশ্বর জীব থেকে উৎকৃষ্ট(superior)। কারণ জীব পরমেশ্বরের সেবক। পরমেশ্বর সব দিক থেকেই পূর্ণ এবং স্বাধীন। অথচ জীব তাঁর উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল। পরমেশ্বর বিভিন্ন ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণ। আবার একই সাথে বা যুগপৎভাবে (simultaneously) তিনি তার স্বরূপে সব ধরনের প্রকাশিত (জড় জগৎ) এবং অপ্রকাশিত (চিন্ময় জগৎ) বিষয় থেকে সর্বোৎকৃষ্ট।

বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ অনুযায়ী মুক্তির পরও জীব এবং পরমেশ্বর-এর মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য বিরাজমান থাকে। কারণ তখনও জীব সেবক এবং পরমেশ্বর সেব্য হিসাবেই বিরাজ করেন।

৩.২. শ্রী মধ্বাচার্য এবং শুদ্ধ দ্বৈতবাদ

ভারতের কানাড়া জেলার প্রধান নগর মাঙ্গালোর থেকে ৩৬ মাইল উত্তরে উড়ুপী গ্রামে পাজকা ক্ষেত্রে শিবান্নী ব্রাহ্মণ বংশে শ্রী মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে ও শ্রীমতি বেদবিদ্যার গর্ভে বাসুদেব নামে এক সন্তান জন্ম নেয়। পরবর্তীকালে ইনিই মধ্বাচার্য নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর জন্ম বছর সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন তিনি ১০৪০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবার অন্যদের মতে তিনি ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে আবিভূর্ত হয়ে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট হন **(উৎসঃ ভগবৎ দর্শন। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের মাসিক পত্রিকা আগস্ট ১৯৮৮ পৃ. ১৯)**। তবে অনেক বিতর্কের পর ১১৬০ শকাব্দে তাঁর আবির্ভাব বর্তমানকালে স্বীকৃত হয়েছে। ইংরেজি সাল বিবেচনা করলে তাঁর আবির্ভাব ১২৩৯ খৃস্টাব্দ এবং তিরোভাব ১৩১৯ খৃস্টাব্দ ধরা হয়। (উৎস ঃ Satsvarupa dasa Gosvami, Elements of Vedic Thought and Culture, P–51)। মতান্তরে বোম্বাই প্রদেশের উদীপি কৃষ্ণগ্রামে শ্রী মধ্বাচার্য আবির্ভুত হন **(উৎসঃ শ্রী বিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী ⟹ বঙ্গে সামাজিকতা)**।

দ্বাদশ বর্ষে আচার্য অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট তিনি দীক্ষিত হন ও সন্যাস গ্রহণ করেন। সন্যাস নাম হয় আনন্দতীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ। শ্রী শঙ্করাচার্য বেদান্তসূত্রে অদ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন। শ্রী মধ্বাচার্য ঐ অদ্বৈতবাদ খন্ডন করে বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁকে বায়ুদেবতার অবতার বলা হয়। গৌড়িয় সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষন নিজ সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত বলেছেন।

শ্রী মধ্বাচার্য এক সময় গোপীচন্দনপূরিত একটি নৌকা থেকে উড়ুপীকৃষ্ণ (নৃত্যরত গোপাল মূর্ত্তি) শ্রী বিগ্রহ পান। এই শ্রী বিগ্রহের এক হাতে দধিমন্থনের দন্ড এবং অপর হাতে মন্থন-দড়ি ছিল। এই মূর্ত্তি ভারী হলেও শ্রী মধ্বাচার্য একাই এটিকে বড় ভন্ডেশ্বর নামক স্থান থেকে বহন করে এনেছিলেন।

শ্রী মধ্বাচার্য পরমেশ্বর, জীব এবং জগৎ – এই তিনের সম্পর্কের ব্যাপারে বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখা এবং ভাষ্যে তিনি যেসব বক্তব্য এবং উক্তি করেন সেগুলোর সারাংশ হলো নিম্নরূপ ঃ

(১) বিষ্ণুই পরমতম তত্ত্ব।

(২) তিনি নিখিল আম্নায় বেদ্য (আম্নায় শব্দের অর্থের জন্য ২য় অধ্যায় দেখুন)।

(৩) জড় জগৎ সত্য/বাস্তব, শঙ্করাচার্যের মত মিথ্যা নয় । অর্থাৎ যেখানে শঙ্কর বলেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, সেখানে শ্রী মধ্ব বলেন, ব্রহ্ম তথা পরমেশ্বর ভগবান এবং জগৎ এই উভয়ই সত্য এবং বাস্তব।

(৪) পরমেশ্বর ও জীব (আত্মা) এবং জড় জগতের মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ রয়েছে।

(৫) জীব (আত্মা) হল হরি (পরমেশ্বর ভগবান) বা বিষ্ণুর দাস।

(৬) জীবগনের মধ্যেও তারতম্য/ভেদ রয়েছে।

(৭) বিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভই মোক্ষ বা মুক্তির একমাত্র উপায়।

(৮) প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দই প্রমাণ। অর্থাৎ মধ্ব মতে শ্রীল ব্যাসদেবের পরিনামবাদ (যে মতবাদে ঈশ্বরকেই সব কিছুর উৎস বলে স্বীকার করা হয়) স্বীকৃত।

তাঁর বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের সপক্ষে শ্রী মধ্বাচার্য যে সব গ্রন্থ ও ভাষ্য লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত সমূহ প্রধান।

(i) গীতাভাষ্য (ii) ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য (iii) অনুভাষ্য (iv) প্রমাণ লক্ষণ (v) তত্ত্ব বিবেক (vi) ঋগ্‌ভাষ্য (vii) উপনিষদের ভাষ্য (viii) গীতা তাৎপর্য নির্ণয় (ix) দ্বাদশ স্তোত্র (x) শ্রীকৃষ্ণামৃত মহার্নব (xi) শ্রীমদ্ ভাগবত- তাৎপর্য (xii) শ্রী মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয় এবং (xiii) শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি।

শ্রীমন্ মধ্ব ব্রহ্মসূত্রের তিনটি ভাষ্য রচনা করেন।

(i) শ্রীমদ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যং বা সূত্রভাষ্যং ঃ তাঁর এই ভাষ্যটি সবচেয়ে বড়। এতে অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরান এবং পঞ্চরাত্রের প্রমাণের সাহায্যে শ্রী ব্যাসদেবের সব ধরনের সূত্র যে একই সূত্রে গাথা এবং শুদ্ধ-দ্বৈত তাৎপর্যপূর্ণ তাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এতে পূর্বাপর আচার্যগণের মতবাদের স্পষ্ট খন্ডন নেই। এতে কেবলমাত্র

শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের প্রমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে সঙ্গতি দেখানো হয়েছে।

(ii) **অনুব্যাখ্যানং ঃ** এক্ষেত্রে পূর্বতন আচার্যদের (যেমন শঙ্কর এবং রামানুজের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ) মতবাদ খন্ডন পুর্বক নিজের শুদ্ধ দ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা হয়েছে।

(iii) **অনুভাষ্য ঃ** ব্রহ্মসূত্রের প্রতিটি অধিকরনের তাৎপর্য এতে শ্লোকের আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার গীতাভাষ্যে তাঁর মতবাদ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে। **মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয়ে** শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ যে অসার এবং অবাস্তব তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তবে ভাষ্যে ব্রহ্ম বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক বিষয়ে যে সব শ্লোক বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটিতে ভেদ ও অভেদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন নারায়নে অবয়বী ও অবয়ব সমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান ও শক্তি এবং অংশী ও অংশ এদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্তমান। জীবের স্বরূপ এবং চিৎরূপ প্রকৃতিতেও ঐরূপ অভেদ বিদ্যমান। পরমেশ্বরের শক্তিহেতু জীবসমূহে এবং চিদ্ রূপা প্রকৃতিতে ভেদ এবং অভেদ যুগপৎভাবে (একই সঙ্গে) বর্তমান। আবার নিমিত্ত কারণ ব্যতীত কার্য ও কারণের মধ্যেও এরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য।

শ্রী মধ্বাচার্য বলেন যে মুক্তি লাভের পরও জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে ভেদ থেকে যায়। এক্ষেত্রেও জীব সেবক এবং পরমেশ্বর ভগবান সেব্য থেকে যান ঃ **"জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্বদৈব বিলক্ষনৌ।"** আবার জড়জগৎ অনিত্য বা ক্ষয়শীল বটে কিন্তু মিথ্যা নয়। আবার ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন নয়। নারায়নকে বন্দনা করাই সদ্‌গুণ বলা যায়। তাহলেই জীবের মুক্তি সম্ভব– এই হল শ্রী মধ্বাচার্যের সব বক্তব্যের সার কথা।

মাধ্বমতের অনুসারী বা সম্প্রদায়ের আচার্যগণ উরুপী গ্রামে অবস্থিত মূল মাধ্ব মঠকে **"উত্তরাদি মঠ"** বলেন। এটি শ্রীকৃষ্ণ মঠ নামেও পরিচিত। এই মঠের মূল অধীশ্বর হলেন শ্রী পদ্মনাভ তীর্থ। উরুপীর ৮ মঠের নাম, মূল পুরুষ এবং বিগ্রহের নাম নিম্নরূপ।

মঠের নাম	**মঠের মূল পুরুষ**	**বিগ্রহের নাম**
১. পলিমার	শ্রী হৃষিকেষ তীর্থ	শ্রী রামচন্দ্র।
২. অদমার	শ্রী নরহরি তীর্থ	শ্রীকৃষ্ণ।
৩. কৃষ্ণাপুর	শ্রী জনার্দন তীর্থ	চতুর্ভূজ কালীয় মর্দন কৃষ্ণ।
৪. পুর্ত্তিগে	শ্রী উপেন্দ্র তীর্থ	বিট্‌ঠল দেব।
৫. শ্রী রুরু	শ্রী বামন তীর্থ	বিট্‌ঠল দেব।

৬. সোদে	শ্রী বিষ্ণু তীর্থ	ভূ-বরাহ দেব।
৭. কানরু	শ্রী রাম তীর্থ	নৃ-সিংহদেব।
৮. পেজাবর	শ্রী অধোক্ষজ তীর্থ	বিট্‌ঠলদেব।

এ জগৎ থেকে অপ্রকটের পূর্বে শ্রীল মধ্বাচার্য তাঁর আটজন সন্যাসী শিষ্যের উপর শ্রীকৃষ্ণ মঠের তত্ত্বাবধানের ভার এবং ঐ অঞ্চলে কৃষ্ণ-ভাবনামৃত প্রচার করার ভার অর্পণ করেছিলেন। আজও মন্দিরের সেবা-পূজার দায়িত্ব দু'বছর পর্যায়ক্রমে মূল আটজন আচার্যের পরম্পরায় আটজন সন্যাসীর উপর ন্যস্ত হয়। পর্যায়ের অন্তবর্তী ১৪ বছর প্রত্যেক সন্যাসী ভ্রমন করে প্রচার করে পূজার অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রত্যেক আচার্য নিজের সময় স্বয়ং প্রতিদিন ১৩ বার শ্রী বিগ্রহের সেবা পূজা করেন।

উরুপীর শ্রী বিগ্রহগণের নবম উপাচারে নিত্য পুজা হয়। এই উপাচারগুলো হল ঃ (i) মনবিসর্জন বা মন্দির পরিষ্কার (ii) উপস্থান বা শ্রী বিগ্রহের নিদ্রাভঙ্গ (iii) পঞ্চামৃত বা দধি-দুগ্ধ দ্বারা স্নান (iv) উদ্বর্ত্তন বা গাত্র মার্জন (v) তীর্থ পুজা বা তীর্থজলে স্নান (vi) অলঙ্কার ধারন (vii) আবৃত্তি বা গীত ও স্তোত্রাদি পাঠ (viii) মহাপুজা বা ফল-পুস্প-গন্ধ প্রদান ও গালবাদ্য এবং (ix) রাত্রি পুজা বা আরতি, ভোগদান ও গীতবাদ্য।

শ্রী মাধ্ব সম্প্রদায়ীগণকে দাসকূট (ভজনানন্দী) এবং ব্যাসকূট (গোষ্ঠানন্দী) নামে দুই বিভাগে এক সময় পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় দলেরই বহু গ্রন্থ রয়েছে।

শ্রী মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা হল ঃ **শ্রীকৃষ্ণ ⟹ ব্রহ্মা ⟹ নারদ ⟹ ব্যাসদেব ...... অচ্যুতপেক্ষ ⟹ মধ্বাচার্য ⟹ পদ্মনাভ ⟹ নরহরি ⟹ মাধব ⟹ অক্ষোভ্য ⟹ জয়তীর্থ ⟹ জ্ঞান সিন্ধু ⟹ দয়ানিধি ⟹ বিদ্যানিধি ⟹ রাজেন্দ্র ⟹ জয়ধর্ম ⟹ বিষ্ণুপুরী ⟹ পুরুষোত্তম ⟹ ব্যাসতীর্থ ⟹ লক্ষ্মীপতি ⟹ মাধবেন্দ্রপুরী ⟹ ঈশ্বরপুরী।**

ঈশ্বরপুরী থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ ⟹ ষড়গোস্বামী, এই গুরু পরম্পরা অনুসারে অনেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষন নিজ সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত বলেছেন।

৩.৩. রামানুজের দর্শনের সাথে মধ্বাচার্যের দর্শনের তুলনা/পার্থক্য (বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সাথে শুদ্ধ দ্বৈতবাদের পার্থক্য/তুলনা)

শ্রী মধ্বাচার্য দ্বৈতভাষ্যের প্রবর্ত্তক। তাঁর **ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে** দার্শনিক তত্ত্বের গভীর আলোচনা না থাকলেও **অনুভাষ্যে** পান্ডিত্যের পরিচয় দেখা যায়। তিনি জীবের

অনুত্ব (জীব পরমেশ্বর ভগবানের অনুচৈতন্য শক্তি) দাসত্ব (জীব ভগবানের সেবক বা নিত্যদাস), বেদের অপৌরুষেয়ত্ব (বেদ শাস্ত্রাদি স্বয়ং ভগবানের বাণী) ইত্যাদি বিষয়ে শ্রী রামানুজের সাথে প্রায় একমত হন। কিন্তু শ্রী রামানুজের ঈশ্বর, চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (জড়) – এই তত্ত্বত্রয়ের (তিন তত্ত্ব) সাথে তিঁনি একমত হন নাই।

শ্রী রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে শ্রী ভগবান স্বীয় শক্তি দ্বারা ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ এই তিন তত্ত্ব বা বিভাগে নিত্য প্রকাশমান। এক্ষেত্রে চিৎ (জীব বা আত্মা) এবং অচিৎ (জড় জগৎ বা বস্তু) উভয়ের ঈশ্বর ভগবান। আর সর্বশক্তি, স্বপ্রকাশ জগৎ প্রভু বাসুদেবই ঈশ্বর। উপরোক্ত তিনটি তত্ত্বই পুরুষোত্তম শ্রীহরির রূপ।

কিন্তু শ্রী মধ্বাচার্য রামানুজের এই মতের সাথে একমত হন নাই। তিনি তাঁর **তত্ত্ব বিবেক** গ্রন্থে মূলত দুটি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ ভগবান এবং জীব। পরমেশ্বর ভগবান হলেন সেব্য এবং জীব হল সেবক। ভৃত্য যেমন রাজা থেকে ভিন্ন তেমনি জীব থেকে ভগবান ভিন্ন। জড় বস্তুও ভগবানের সৃষ্টি। তবে জড়বস্তুর সাথে ভগবানের সেব্য এবং সেবক সম্পর্ক নেই। তাই এক্ষেত্রে মূলতঃ দুটি তত্ত্বই বিরাজমান।

শ্রীরামানুজ তার ঈশ্বর তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগৎ তত্ত্ব-এই তত্ত্ব ত্রয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সমজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নেই। কারণ সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী ব্রহ্মের বাইরে সমজাতীয় বা ভিন্নজাতীয় কিছু নেই। ব্রহ্মের অপর দুটি রূপ হল জীব ও জগৎ। এগুলো ব্রহ্মেরই অর্ন্তগত। তাই ব্রহ্মের মতই সত্য কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম নয়। এই অর্থে ব্রহ্মের স্বগত ভেদ আছে। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে ধর্মতঃ ভিন্ন হলেও ব্রহ্মাশ্রয়ী ও পৃথক সত্ত্বাহীন বলে অভিন্ন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে, ব্রহ্ম ও জগৎ এর মধ্যে এবং জীব ও জগতের মধ্যে তিন ধরনের ভেদ রয়েছে। কিন্তু জীব ও জগৎ ব্রহ্মের আশ্রিত বলে অভেদ রূপে তত্ত্ব মাত্র একটি-চিদ্ চিদ্ বিশিষ্ট ঈশ্বর। শ্রী রামানুজ শক্তিমান (ঈশ্বর) ও শক্তিকে (জীব) স্বীকার করেন।

অন্যদিকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ অনুযায়ী ভেদ পাঁচ ধরনের ঃ (i) জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ (ii) জড় এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ (iii) বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদ (iv) জড় ও জীবের মধ্যে ভেদ এবং (v) বিভিন্ন জড়ের মধ্যে ভেদ।

আবার রামানুজীয় দর্শনে জড় ও জীবে এবং জীবে জীবে ভেদ দেখানো হয় নাই। কারণ এই দর্শনে সবকিছু ব্রহ্মের আশ্রিত বলায় এরূপ ভেদ-বিবেচনার অবকাশ নেই। কিন্তু মধ্ব-দর্শনে এসব ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। যেমন কর্ম এবং

ভক্তির তারতম্য অনুসারে জীব সকলের মধ্যে ভেদ রয়েছে। আবার গুণ ও রূপ অনুযায়ী বিভিন্ন জড়ের মধ্যেও ভেদ আছে। এরূপ বিস্তৃত ভেদ-ব্যাখ্যা রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে নেই।

রামানুজী এবং মধ্ব সম্প্রদায় বৈষ্ণব হলেও উপাসনা এবং সম্প্রদায়গত চিহ্নাদির দিক থেকেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

৩.৪ মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের কতিপয় বিখ্যাত বৈষ্ণব / আচার্য

মধ্বাচার্য সম্প্রদায় গুরু পরম্পরা দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী বলা যায়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন বৈষ্ণব আচার্যের জীবন ও দর্শন সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল।

৩.৪.১. শ্রী ব্যাস তীর্থ (১৪৬০ – ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ)

শ্রী ব্যাসতীর্থ শ্রী মধ্ব থেকে চতুর্দশ অধস্তন ও বিজয়নগরের রাজা শ্রী কৃষ্ণদেবাচার্যের গুরু ছিলেন বলে কথিত। তিনি **তর্ক-তান্ডব তাৎপর্যচন্দ্রিকা, ন্যায়ামৃত, ভেদোজ্জীবন, খন্ডন ক্রয়-মন্দার-মঞ্জুরী, তত্ত্ববিবেক মন্দার মঞ্জরী** ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শ্রী ব্যাসতীর্থ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক তাত্ত্বিক আচার্য ছিলেন। শ্রী জীব গোস্বামী তাঁর **তত্ত্ব সন্দর্ভ** গ্রন্থে শ্রী ব্যাসতীর্থকে **বেদবেদার্থবিৎ** শ্রেষ্ঠ বলে গৌরব মন্ডিত করেছেন।

৩.৪.২ শ্রী লক্ষ্মীপতি

শ্রী লক্ষ্মীপতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সময় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এটুকু জানা গেছে যে তিনি শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু ছিলেন। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু এক সময় তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে পান্ডারপুর নামক স্থানের বিট্‌ঠলনাথজীর মন্দিরের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রী লক্ষ্মীপতি গোস্বামীর সাক্ষাৎ পান। ঐ সময়ে লক্ষ্মীপতি স্বপ্নে এক আদেশ পান যে তাকে ব্রাহ্মণের গৃহে আগত পরিব্রাজককে দীক্ষাদান করতে হবে। অপরদিকে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু প্রভাতে শ্রী লক্ষ্মীপতির সমীপে উপস্থিত হলে তিনি তাকে মহানন্দে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করেন। শ্রী নিত্যানন্দ তাঁর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করলে লক্ষ্মীপতি প্রভুকে দীক্ষিত করেন। দীক্ষান্তে নিত্যানন্দ প্রভু অন্যস্থানে গমন করেন। এ অবস্থায় লক্ষ্মীপতি তাঁর পরম প্রিয়

শিষ্যের জন্য এতটাই কাতর হয়ে পড়েন যে অচিরেই তিনি স্বধামে গমন করেছিলেন বলে কথিত আছে।

৩.৪.৩ শ্রী পাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রী বিষ্ণুভক্তি পথের প্রথম অবতারী। শ্রী ঈশ্বরপুরী এবং শ্রী অদ্বৈতপ্রভুর গুরু এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরম গুরু। তিঁনি এতটাই প্রেমময় ছিলেন যে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কল্পবৃক্ষের মূল শক্তি বা অংকুর বলা হয়।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে প্রতীচী তীর্থে মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দকে বন্ধুজ্ঞানে সমাদর এবং আলাপ করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা উভয়ে মিলিত হলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত হতেন। এমনকি অনেক সময় মুর্চ্ছা যেতেন।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন ভক্তিরসের আদি সূত্রধার। অনেক সময় মেঘদর্শনেও তিনি কৃষ্ণপ্রেমে অচেতন হতেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিক সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে প্রেমসম্পদ দান করেন।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী এক সময় শান্তিপুরে আগমন করে শ্রী অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে অবস্থান করেন। এই সময়েই শ্রী অদ্বৈতপ্রভু তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রেম সেবা গ্রহণের জন্যই শ্রী গোবর্দ্ধন গিরিরাজে শ্রী শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রকট হয়েছিলেন। তখন সেখানে নিত্য অন্নকূট মহোৎসব চালানো হয়েছিল। মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করত শ্রীগোপালের অঙ্গে লেপনের জন্য আদিষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্রপুরী একসময় নীলাচলে আগমন করেন। পথিমধ্যে রেমুনায় শ্রী গোপীনাথ তাঁর জন্য ক্ষীর চুরি করে **ক্ষীরচোরা গোপীনাথ** নামে আখ্যা লাভ করেন।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী দীর্ঘকাল জড়জগতে অবস্থান করে প্রেমভক্তি বিতরন করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তিনি বহু লোককে জীবনে কৃপা করেছেন। তাঁর কৃপা প্রাপ্তদের সঠিক সংখ্যা না পাওয়া গেলেও প্রধান প্রধান কিছু সন্যাসী ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ শ্রী অদ্বৈতাচার্য, শ্রী পুন্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রী ঈশ্বরপুরী, শ্রী পরমানন্দপুরী, শ্রী রঙ্গপুরী, শ্রী ব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রী ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রী কেশব ভারতী, শ্রী কৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীরামচন্দ্র পুরী, শ্রী সুখানন্দপুরী প্রমুখ।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী অপ্রকটকালে নিচের শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্॥"

শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ উপরোক্ত শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ভরসের সার স্বরূপ মনে করেন। ভগবান শ্রী গৌরসুন্দর এই শ্লোক স্মরণ মাত্রই প্রেমে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন।

৩.৪.৪ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। তিনি কুমারহট্ট (বর্তমানে পশ্চিম বাংলার উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহর নামক স্থান) গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে জৈষ্ঠ্য মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আবির্ভূত হন। পিতার নাম– শ্রীল শ্যামসুন্দর আচার্য। শ্রী ঈশ্বরপুরীর সংসার আশ্রমের নাম জানা যায় না। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুকে গৃহ ত্যাগ করান। ঈশ্বরপুরী নাম হয় সন্যাস আশ্রমে। তিঁনি শ্রী মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

শ্রী ঈশ্বরপুরী একসময় নবদ্বীপে এসে শ্রী গোপীনাথ আচার্যের গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি শ্রী অদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাসভবনে মাঝে মাঝে আসতেন এবং তাঁদের সাথে কৃষ্ণকথায় লিপ্ত হতেন। এখানে অবস্থানকালীন সময়েই শ্রী ঈশ্বরপুরী শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিঁনি এই গ্রন্থ শ্রী গদাধরকে অধ্যয়ন করাতেন। এই সময়ে শ্রী মন্ মহাপ্রভু শ্রী ঈশ্বরপুরীকে রোজ সন্ধ্যাবেলায় প্রণাম করবার জন্য আসতেন। পরবর্তীতে গয়াধামে পিতৃপিন্ড দেয়ার সময় মহাপ্রভুর সাথে আবার ঈশ্বরপুরীর দেখা হয়। মহাপ্রভুর অনুরোধে ঐ সময় শ্রী ঈশ্বরপুরী তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করেন।

শ্রী ঈশ্বরপুরী তাঁর অপ্রকটের পূর্বে নিজের দুইজন সেবক শ্রী গোবিন্দ এবং শ্রী কাশীশ্বর পন্ডিতকে মহাপ্রভুর নিকট তার সেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি পুরীধামেই অপ্রকট হয়েছিলেন।

৩.৪.৫ শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন উড়িষ্যার অর্ন্তগত বালেশ্বর জেলার রেমুনার নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে (মতান্তরে সপ্তদশ শতাব্দীতে) আবির্ভূত হন। চিল্কা হ্রদের তীরে কোনও বিদ্বান বসতি স্থলে তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর বেদ অধ্যয়নের জন্য মহীশূরে গমন করেন। এ সময়েই তিনি মাধ্ব সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হন। পরে সন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজকরূপে পুরীধামে উপস্থিত হন। সেখানকার পন্ডিত সমাজকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করে তত্ত্ববাদি মঠে অবস্থান করেন।

কিছুদিন পর শ্রী বলদেব শ্রী রসিকানন্দ প্রভুর (শ্রী শ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য) প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী শ্রী রাধাদামোদর প্রভুর কাছে ষটসন্দভ অধ্যয়ন করে গৌড়ীয়

শিষ্যের জন্য এতটাই কাতর হয়ে পড়েন যে অচিরেই তিনি স্বধামে গমন করেছিলেন বলে কথিত আছে।

৩.৪.৩ শ্রী পাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রী বিষ্ণুভক্তি পথের প্রথম অবতারী। শ্রী ঈশ্বরপুরী এবং শ্রী অদ্বৈতপ্রভুর গুরু এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরম গুরু। তিনি এতটাই প্রেমময় ছিলেন যে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কল্পবৃক্ষের মূল শক্তি বা অংকুর বলা হয়।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে প্রতীচী তীর্থে মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দকে বন্ধুজ্ঞানে সমাদর এবং আলাপ করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা উভয়ে মিলিত হলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত হতেন। এমনকি অনেক সময় মুর্চ্ছা যেতেন।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন ভক্তিরসের আদি সূত্রধার। অনেক সময় মেঘদর্শনেও তিনি কৃষ্ণপ্রেমে অচেতন হতেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিক সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে প্রেমসম্পদ দান করেন।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী এক সময় শান্তিপুরে আগমন করে শ্রী অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে অবস্থান করেন। এই সময়েই শ্রী অদ্বৈতপ্রভু তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রেম সেবা গ্রহণের জন্যই শ্রী গোবর্দ্ধন গিরিরাজে শ্রী শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রকট হয়েছিলেন। তখন সেখানে নিত্য অন্নকূট মহোৎসব চালানো হয়েছিল। মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করত শ্রীগোপালের অঙ্গে লেপনের জন্য আদিষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্রপুরী একসময় নীলাচলে আগমন করেন। পথিমধ্যে রেমুনায় শ্রী গোপীনাথ তাঁর জন্য ক্ষীর চুরি করে **ক্ষীরচোরা গোপীনাথ** নামে আখ্যা লাভ করেন।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী দীর্ঘকাল জড়জগতে অবস্থান করে প্রেমভক্তি বিতরন করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তিনি বহু লোককে জীবনে কৃপা করেছেন। তাঁর কৃপা প্রাপ্তদের সঠিক সংখ্যা না পাওয়া গেলেও প্রধান প্রধান কিছু সন্যাসী ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ শ্রী অদ্বৈতাচার্য, শ্রী পুন্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রী ঈশ্বরপুরী, শ্রী পরমানন্দপুরী, শ্রী রঙ্গপুরী, শ্রী ব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রী ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রী কেশব ভারতী, শ্রী কৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীরামচন্দ্র পুরী, শ্রী সুখানন্দপুরী প্রমুখ।

শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী অপ্রকটকালে নিচের শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্॥"

শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ উপরোক্ত শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ভরসের সার স্বরূপ মনে করেন। ভগবান শ্রী গৌরসুন্দর এই শ্লোক স্মরণ মাত্রই প্রেমে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন।

৩.৪.৪ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। তিনি কুমারহট্ট (বর্তমানে পশ্চিম বাংলার উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহর নামক স্থান) গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে জৈষ্ঠ্য মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আবির্ভূত হন। পিতার নাম– শ্রীল শ্যামসুন্দর আচার্য। শ্রী ঈশ্বরপুরীর সংসার আশ্রমের নাম জানা যায় না। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুকে গৃহ ত্যাগ করান। ঈশ্বরপুরী নাম হয় সন্যাস আশ্রমে। তিঁনি শ্রী মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

শ্রী ঈশ্বরপুরী একসময় নবদ্বীপে এসে শ্রী গোপীনাথ আচার্যের গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি শ্রী অদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাসভবনে মাঝে মাঝে আসতেন এবং তাঁদের সাথে কৃষ্ণকথায় লিপ্ত হতেন। এখানে অবস্থানকালীন সময়েই শ্রী ঈশ্বরপুরী শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিঁনি এই গ্রন্থ শ্রী গদাধরকে অধ্যয়ন করাতেন। এই সময়ে শ্রী মন্ মহাপ্রভু শ্রী ঈশ্বরপুরীকে রোজ সন্ধ্যাবেলায় প্রণাম করবার জন্য আসতেন। পরবর্তীতে গয়াধামে পিতৃপিন্ড দেয়ার সময় মহাপ্রভুর সাথে আবার ঈশ্বরপুরীর দেখা হয়। মহাপ্রভুর অনুরোধে ঐ সময় শ্রী ঈশ্বরপুরী তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করেন।

শ্রী ঈশ্বরপুরী তাঁর অপ্রকটের পূর্বে নিজের দুইজন সেবক শ্রী গোবিন্দ এবং শ্রী কাশীশ্বর পন্ডিতকে মহাপ্রভুর নিকট তার সেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি পুরীধামেই অপ্রকট হয়েছিলেন।

৩.৪.৫ শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন উড়িষ্যার অর্ন্তগত বালেশ্বর জেলার রেমুনার নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে (মতান্তরে সপ্তদশ শতাব্দীতে) আবির্ভূত হন। চিল্কা হ্রদের তীরে কোনও বিদ্বান বসতি স্থলে তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর বেদ অধ্যয়নের জন্য মহীশূরে গমন করেন। এ সময়েই তিনি মাধ্ব সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হন। পরে সন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজকরূপে পুরীধামে উপস্থিত হন। সেখানকার পন্ডিত সমাজকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করে তত্ত্ববাদি মঠে অবস্থান করেন।

কিছুদিন পর শ্রী বলদেব শ্রী রসিকানন্দ প্রভুর (শ্রী শ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য) প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী শ্রী রাধাদামোদর প্রভুর কাছে ষটসন্দভ অধ্যয়ন করে গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্মের নিগুঢ় মর্মে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীরাধা দামোদরের শিষ্য হন। শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন শ্রী পীতাম্বরদাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শ্রী বলদেব মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বৈরাগ্য বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করে শ্রী বলদেব **"একান্তি গোবিন্দ দাস'** নামে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনের শ্রী শ্যামসুন্দর বিগ্রহ তিনিই স্থাপন করেছিলেন। শ্রী উদ্ধব দাস ও শ্রী নন্দ মিশ্র তাঁর প্রধান দুই শিষ্য ছিলেন। তিনি গৌড়ীয় বেদান্ত আচার্য এবং শ্রী গোবিন্দ গ্রন্থের ভাষ্যকার ছিলেন। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শেষ বয়সে এক সময় শ্রী বৃন্দাবনে খবর আসে যে জয়পুরের বিভিন্ন মন্দির থেকে বাঙ্গালী সেবায়তগণকে অসম্প্রদায়ী বলে সেবাচ্যুত করা হয়েছে (উল্লেখ্য ঐ সময়ে জয়পুরে শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের আধিপত্য ছিল এবং তাদের প্ররোচনাতেই মাধ্ব সম্প্রদায়ী বাঙ্গালী সেবকদেরকে বিভিন্ন মন্দির থেকে সেবাচ্যুত করা হয়েছিল)। ঐ সময় শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আদেশে শ্রীবলদেব শ্রীমদ্ কৃষ্ণদেব সার্বভৌম সহ জয়পুরে উপস্থিত হয়ে শাস্ত্রীয় বিচারে শ্রী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণকে পরাজিত করে গলতা নামক পার্বত্য প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে তিঁনি শ্রী বিজয় গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি গোবিন্দের কৃপাদেশে **"শ্রী গোবিন্দভাষ্য"** রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গৌরব বৰ্দ্ধিত করেন।

উল্লেখ্য যে শ্রী সম্প্রদায়ের অনেক পন্ডিত বলদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেও তিনি বিনীতভাবে তা অস্বীকার করেছিলেন। কারণ চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী সম্প্রদায় দাস্য ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বমান্য। তাঁদের কোন প্রকার মর্যাদাহানি হলেই অপরাধের সম্ভাবনা।

শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন যে সব গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত সমূহ প্রধান।

(i) ষটসন্দর্ভের টীকা (ii) লঘুভাগবতামৃতের টীকা (iii) সিদ্ধান্ত রত্ন (iv) বেদান্ত স্যমন্তক (v) প্রমেয় রত্নাবলী (vi) সিদ্ধান্ত দর্পন (vii) শ্যামানন্দ শতকের টীকা (viii) নাটকচন্দ্রিকার টীকা (ix) সাহিত্য কৌমুদী (x) ছন্দঃকৌস্তুভ (xi) কাব্য কৌস্তুভ (xii) শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকা (xiii) বৈষ্ণবানন্দিনী (xiv) শ্রী গোপাল তাপনী ও শ্রী ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য (xv) স্তব মালার ভাষ্য (xvi) ঐশ্বর্য কাদম্বিনী।

এসব গ্রন্থ রচনা করে তিঁনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভূত সেবা করেন।

শ্রী মধ্বাচার্যের বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা শ্রীবলদেব তাঁর প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ৯টি প্রমেয় স্বীকার করে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেন। বইটির এক একটি অধ্যায়ে এক একটি প্রমেয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১. প্রথম প্রমেয় ⟹ এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব বিবেচিত। কারণ তিনিই সবকিছুর হেতু, বিভুচৈতন্য (সর্বব্যাপী চৈতন্য), সর্বজ্ঞ, আনন্দী, প্রভু, সুহৃদ, জ্ঞানদ, মুক্তিপ্রদ ও মাধুর্যপূর্ণ।

শ্রীভগবান নিত্যলক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হন। তার পরাশক্তিই (উৎকৃষ্ট বা অন্তরঙ্গা শক্তি) লক্ষ্মী, অপরাশক্তি (নিকৃষ্ট শক্তি) ক্ষেত্রজ্ঞ (জড়জগৎ) ও তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা (মায়া)। পরাশক্তিই বিষ্ণুর অভিন্না ও হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-এই তিনরূপে বিরাজিতা। বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর অবতারসমূহে তুল্য পূর্ত্তি থাকলেও গুণ প্রকাশের তারতম্য অনুযায়ী অংশ ও অংশিভাব (অংশাংশিভাব) স্বীকৃত হয়। স্বরূপ, পার্ষদ ও ধাম অনন্ত বলে তাঁর লীলাও নিত্য।

২. দ্বিতীয় প্রমেয় ⟹ বেদান্ত সাক্ষাৎ এবং বেদসমূহ পরম্পরারূপে শ্রী হরির গণন করে। শ্রী হরির জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এবং ভক্তিপদবাচ্য। জ্ঞান পরিশুদ্ধ হলেই সবিশেষ ও নির্বিশেষের দ্বন্দ্ব পরিহার করে মন শ্রী হরিকে লক্ষ্য ও অনুসন্ধান করে। সুতরাং শ্রী হরিই অখিল বেদ-বেদ্য।

৩. তৃতীয় প্রমেয় ⟹ এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু অনিত্য বা নশ্বর। যে সব স্থানে বিশ্বকে (জড় জগৎকে) অনিত্য (মিথ্যা) রূপে বলা হয়েছে সেখানে বৈরাগ্য উৎপাদনই মূল উদ্দেশ্য।

8. চতুর্থ প্রমেয় ⟹ ঈশ্বর এবং জীবের ভেদ কোন কল্পনা নয়, বরং বাস্তব। কেউ কেউ সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি ইত্যাদি দ্বারা (যেমন শঙ্করাচার্য) সবকিছুকেই ব্রহ্মরূপ বলেন। আবার অন্যেরা (যেমন রামানুজ) বলেন জগতে ব্রহ্মই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। কোনও জাগতিক বস্তুই ব্রহ্ম শূন্য হতে পারে না। এজন্য জগতের ক্ষেত্রেও ব্রহ্ম শব্দ আরোপ করা হয়। এখন পঞ্চভূত (মাটি, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ) দ্বারা গঠিত বিশ্বে জীবকে যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ধরা হয় তবে ব্রহ্মের বিভুত্ব ও নির্বিশেষ রূপের হানি হয়। কারণ কোনও সীমাবদ্ধ ও রূপবান বস্তুরই কেবল প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই উপরোক্ত দুই মতবাদই অগ্রাহ্য করা যায়।

৫. পঞ্চম প্রমেয় ⟹ জীব ভগবানের দাস। ব্রহ্মা এবং রুদ্রাদি দেবতারাও শ্রী হরির আরাধনা করেন। তাই শ্রী ভগবানের দাসই জীবের স্বরূপ।

৬. ষষ্ঠ প্রমেয় ⟹ অণুচৈতন্য, সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট, কর্মকর্ত্তা এবং ফলভোক্তা হিসাবে সকল জীব সমান হলেও কর্ম ও ভক্তির তারতম্যে জীবের মধ্যে ভেদ আছে। কর্মের পার্থক্য হেতু জড়জগতে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন ঐহিক (জড় জাগতিক) ফল প্রাপ্ত হয়। আবার ভক্তির পার্থক্যের কারণে তাদের পারমার্থিক প্রাপ্তি বিভিন্ন ধরনের হয়। সুতরাং কর্ম ও ভক্তির তারতম্য হেতু জীবগণের মধ্যেকার পার্থক্য স্বীকার করতে হয়।

৭. সপ্তম প্রমেয় ⟹ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভই মোক্ষ (মুক্তি)। স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতেই নিত্য সুখ প্রাপ্তি হতে পারে।

৮. অষ্টম প্রমেয় ⟹ অমল কৃষ্ণ ভজনেই মোক্ষ/ মুক্তি লাভ সম্ভব। নিষ্কাম ভক্তির মাধ্যমেই জীবের মুক্তি হতে পারে।

৯. নবম প্রমেয় ⟹ কোন বিষয়ে তিন ধরনের প্রমাণই গ্রাহ্য হতে পারেঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ঐতিহ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষের অর্ন্তভুক্ত। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যভিচারিত্ব দেখা যায় বলে শব্দ প্রমাণই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩.৪.৬ শ্রী নারায়ন ভট্ট শ্রী নারায়ন ভট্ট দক্ষিণ মাদুরার অধিবাসী ভৈরব নামক জনৈক মাধ্ব সম্প্রদায়ী তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী নারায়ন ভট্টের গুরু ছিলেন শ্রী কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। আর শ্রী গদাধর পন্ডিত গোস্বামী ছিলেন তাঁর পরম গুরু (গুরুদেবের গুরু)।

তত্ত্ব মুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষনীকা গ্রন্থের কবি গৌড় পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী শ্রী নারায়ন ভট্টের কাছে দ্বৈতমতে উপদিষ্ট (instructed) হয়েছিলেন। ব্রজতীর্থ উদ্ধার, রাসলীলা অনুকরণের সর্বপ্রথম প্রকাশ, ব্রজযাত্রা ও বনযাত্রার সর্ব প্রথম প্রচার, শ্রীজীব প্রাকট্য, শ্রী বলদেবের প্রাকট্য ইত্যাদি শ্রী নারায়ন ভট্টের অতুলনীয় কীর্তি।

শ্রী নারায়ণ ভট্ট অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে নিম্নোক্তসমূহ হল প্রধান।

(i) ভক্তিরস তরঙ্গিনী (ii) ব্রজভক্তি বিলাস (iii) ব্রজদীপিকা (iv) ব্রজোৎসব চন্দ্রিকা (v) ব্রজ মহোদধি (vi) ব্রজোৎসব বাহ্লাদিনী (vii) বৃহদ ব্রজগুনোৎসব (viii) ব্রজপ্রকাশ (ix) ভক্তভূষন সন্দর্ভ (x) ব্রজসাধন চন্দ্রিকা (xi) ভক্তিবিবেক (xii) সাধনদীপিকা (xiii) রসিকা হ্লাদিনী (শ্রী ভাগবত টীকা) (xiv) প্রেমাঙ্কুর নাটক।

অধ্যায় ঃ চার

শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায় ⟹ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

৪.১ স্বাভাবিক ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) বাদ কি ?

বাস্তব বা স্বাভাবিক ভেদাভেদ বাদ অনুযায়ী তত্ত্ব বা পদার্থ তিন প্রকারঃ চিৎ (জীব), অচিৎ (জগৎ) এবং ব্রহ্ম। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়েও আবার অভিন্ন। জ্ঞানই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের উপায়। ব্রহ্মের ধ্যান, স্মৃতি এবং পরাভক্তি (একনিষ্ঠ ভক্তি) ইত্যাদি হল তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপায় (ব্রহ্ম বলতে এক্ষেত্রে ভগবান বাসুদেব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ)। শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্রহ্মকে পাওয়ার উপায়।

(১) **চিৎ পদার্থ/তত্ত্ব ঃ** চিৎ (জীব) এর লক্ষণ হল যে সব অচিৎ পদার্থ রয়েছে সেগুলো থেকে এটি পৃথক। এদের জ্ঞান রয়েছে। জড়বস্তুর উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা আছে। জীব (আত্মা) হল অনুপরিমাণ-অর্থাৎ অনুচৈতন্য বিশিষ্ট। আবার প্রতি শরীর বা দেহে জীব (আত্মা) ভিন্ন হয়। জীব মোক্ষ বা মুক্তি লাভের প্রয়াসী হতে পারে।

(২) **অচিৎ পদার্থ/তত্ত্ব ঃ** অচিৎ পদার্থ প্রাকৃত, অপ্রাকৃত এবং সময়/কাল ভেদে তিন প্রকার। সত্য, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের আশ্রয়ভূত পদার্থ বা দ্রব্যই প্রাকৃত। এগুলো নিত্য এবং পরিণাম বিকারী। অপ্রাকৃত অচিৎ পদার্থ উপরোক্ত তিনটি গুণ এবং কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন ও অচেতন। নিত্য বিভূতি সম্পন্ন পরব্যোম (বৈকুণ্ঠ), পরমপদ, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি হল অপ্রাকৃত অচিৎ পদার্থ। এই ধাম সমূহ অপ্রাকৃত এবং কালের অতীত (কালের বা সময়ের অধীন নয়)।

(৩) **প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভিন্ন কাল পদার্থ ঃ** এসব নিত্য এবং বিভু। এগুলো বহু শ্রুতি প্রমাণে (উপনিষদ) ভেদাভেদবাদের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে।

স্বাভাবিক ভেদাভেদ বাদ অনুযায়ী চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ কেবলমাত্র সমানভাবে সত্যই নয়, যুগপৎভাবে (একই সংগে) নিত্যও। সব সময় ও সর্ব অবস্থায় এদের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ সমানভাবে বিরাজমান। এক্ষেত্রে ব্রহ্ম হলেন কারণ। অপরপক্ষে জীব ও জগৎ হল তাঁর কার্য। ব্রহ্ম শক্তিমান, জীব ও জগৎ শক্তিদ্বয়। ব্রহ্ম সমগ্র সত্ত্বা, জীব ও জগৎ হল ব্রহ্মের অর্ন্তগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। সুতরাং কারণ ও কার্য, শক্তি ও শক্তিমান, অংশী ও অংশে ভেদ (পার্থক্য) বাস্তব, স্বাভাবিক ও নিত্য।

ব্রহ্ম হলেন ধ্যেয় (যিনি ধ্যানের বস্তু), জ্ঞেয় (যাঁকে জানা প্রয়োজন) এবং প্রাপ্তব্য (যাঁকে পাওয়া সম্ভব)। অন্য দিকে জীব হলেন ধ্যাতা (যিনি ভগবানের ধ্যান

করবেন/করেন), জ্ঞাতা (যে/যারা জ্ঞান দ্বারা পদার্থ জানতে চেষ্টা করেন/জানেন) এবং প্রাপক (ভগবান থেকে অনুগ্রহ যিনি/যারা লাভ করেন/করবেন)।

ব্রহ্ম হলেন সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা। তিনি সর্বব্যাপী ও পূর্ণভাবে স্বাধীন। জীবের কোন সৃষ্টি করার শক্তি নেই। জীব অনুমাত্র এবং ভগবানের অধীন ও শাসিত। আবার শুধু বদ্ধ জীব (যে জীব শুধুমাত্র জড় জাগতিক কর্মেই লিপ্ত) নয় মুক্ত জীবও (পরম ভগবৎ ভক্ত) ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। ব্রহ্ম এবং জীবের এই স্বভাব এবং ধর্মগত ভেদ বা পার্থক্য নিত্য (সব সময় যা বিরাজ করে বা যা কালাতীত)।

ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যেও ভেদ আছে। ব্রহ্ম হলেন চেতন, অজড় (জড় নয়), অস্থুল এবং নিত্যশুদ্ধ। কিন্তু জগৎ হল অচেতন, জড়, স্থুল এবং অশুদ্ধ। তাই ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে স্বভাব এবং ধর্মগত ভেদ নিত্য বিরাজমান।

আবার ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ যেরূপ সত্য, স্বাভাবিক অভেদও তেমনি সমানভাবে সত্য। অর্থাৎ জীব ও জগৎ কার্যকারন (ব্রহ্ম) থেকে গুণ এবং কার্যের দিক থেকে ভিন্ন। কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন। কারণ জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই আশ্রয়গত বা অর্ন্তগত। আবার কারণও (ব্রহ্ম) কার্যের অতিরিক্ত রূপে কার্য (জীব ও জগৎ) থেকে ভিন্ন। কিন্তু কার্যকালীন (কার্যের সময়) এবং কার্য স্বরূপে (কার্যের স্বরূপ/প্রকৃতি) কার্য (জীব ও জগৎ) থেকে অভিন্ন। কার্য (জীব ও জগৎ) কারণ (ব্রহ্ম) থেকে ভিন্ন এই হেতু যে কার্য (জীব ও জগৎ) ও কারণের (ব্রহ্মের) গুণ এবং কার্যাদি (কর্মকান্ড/কাজকর্ম) এক ধরনের নয়। উদাহরণ হিসাবে মাটির পিন্ড এবং মাটির পাত্র বিবেচনা করা যাক। মাটির ঘট মাটির পিন্ড থেকে অবশ্যই ভিন্ন। কারণ ঘটের আকার ও কাজ (জল ধারন) মাটির পিন্ডের আকার এবং কাজ থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতা/ ভেদ থাকলেও মাটির ঘট ও মাটির পিন্ড এক অর্থে অভিন্ন। কারণ মাটির ঘট মাটি ছাড়া অপর কিছুই নয়। এভাবে কার্য (জীব ও জগৎ) আসলে কারণাত্মক ব্রহ্ম থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। কারণসত্ব (ব্রহ্ম সত্ত্বা) এবং কারনাশ্রয়ী (ব্রহ্মের আশ্রিত) অথবা কার্য (জীব এবং জগৎ) এবং কারণ (ব্রহ্ম) অভিন্ন। আবার কারণও (ব্রহ্ম) কার্য (জীব ও জগৎ) থেকে ভিন্ন যেহেতু কারণ (ব্রহ্ম) কোন বিশেষ কার্য (জীব ও জগৎ) ছাড়াও অন্যান্য কার্যেরও (অপরাপর ব্রহ্মান্ড) উৎস (জনক/ সৃষ্টিকারক)। যেমন মাটির পিন্ড মাটির ঘট থেকে ভিন্ন যেহেতু মাটির পিন্ড কেবল ঘট রূপেই পরিণত (ব্যবহার করা) হয় না, চুলা, পুতুলসহ অপরাপর বস্তুতেও পরিণত হতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও মাটির পিন্ড মাটির ঘট থেকে অভিন্ন যেহেতু মাটির ঘটের ন্যায় এটিও মৃত্তিকা (মাটি) স্বরূপ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ তত্ত্ব অনুযায়ী ভেদের অর্থ হল নিম্নরূপ।

(i) কাজের দিক থেকে গুণতঃ কার্য ও কারণ ভিন্ন।

(ii) কারণের দিক থেকে কার্যের অতিরিক্ততা রয়েছে।
অন্যদিকে অভেদের অর্থ হল নিম্নরূপ ঃ
(i) কার্যের দিক থেকে কারণাত্মকতাও কারণাশ্রিত।
(ii) কারণের দিক হতে কার্যলীনত্ব।

এক কথায় বলা যায় ব্রহ্ম জগতের অতিরিক্ত রূপে জীব ও জগৎ থেকে ভিন্ন হলেও জগল্লীনরূপে (জীব ও জগতের আশ্রয়রূপে) জীব ও জগৎ থেকে অভিন্ন।

৪.২ শ্রী নিম্বার্ক এবং স্বাভাবিক ভেদাভেদ বাদ প্রাচীন যুগে যে চারটি সাত্বত সম্প্রদায় (প্রথম অধ্যায়ে সাত্বত মত আলোচিত) ছিল তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান সম্প্রদায়ের আচার্য হলেন শ্রী নিম্বার্ক। তিনি ভারতের তৈলঙ্গ অঞ্চলের বৈদুর্যপত্তনে (মুঙ্গের পত্তন) আরুনি নিম্বাদিত্য বা নিয়মানন্দ নামে আবির্ভূত হন। তিনি ব্রহ্মার চতুঃসন কুমারের অন্যতম সনৎকুমারের শিষ্য শ্রী নারদের নিকট থেকে উপদেশ লাভ করে জগতে যে মত প্রচার করেছিলেন তা বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়েছিল বলে কথিত। এজন্য মনে হয় আচার্য সায়নমাধব তাঁর **সর্বদর্শন সংগ্রহ** গ্রন্থে শ্রী বিষ্ণু স্বামী প্রমুখের মতের কথা উল্লেখ করলেও শ্রী নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু "বিষ্ণুযামল" গ্রন্থের **'নারায়ণমুখাম্ভো জানুমন্ত্রস্তষ্টাদশাক্ষরঃ। আবির্ভূতঃ কুমারৈস্ত গৃহীত্বা নারদায় বৈ॥ উপদিষ্টঃ স্বশিষ্যায় নিম্বার্কায় চ তেন তু'** এবং **'পরম্পরা প্রাপ্তো মন্ত্রস্তষ্টা দশাক্ষরঃ'** ইত্যাদি বচনে নিম্বার্ক আচার্যের চতুঃসন সম্প্রদায়িত্ব স্পষ্ট রয়েছে। শ্রী কমলাকর ভট্ট কর্তৃক লিখিত নির্ণয় সিন্ধু গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেও শ্রী নিম্বার্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার নিম্বার্ক সম্প্রদায়ীরা **ভবিষ্য উত্তরীয়** পুরানের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী নিম্বার্ককে দ্বাপর যুগের শেষ দিকে অবতীর্ণ বলে দাবী করেন। যাই হোক শ্রী নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য শাস্ত্রস্বীকৃত (পদ্মপুরান দ্রষ্টব্য) একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে আচার্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রী নিম্বার্ক শ্রী ঔড়ুলৌমি প্রনীত বেদান্তসূত্র অবলম্বনে **বেদান্ত পারিজাত সৌরভ** নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত ভাষ্য আসলে শ্রী নিবাস আচার্যকৃত (ইনি শ্রী গৌরাঙ্গ ভক্ত শ্রী নিবাস আচার্য ঠাকুর নন) **"বেদান্তকৌস্তব"**। শ্রী নিম্বার্কের শিষ্য শ্রী নিবাস আচার্য অসাধারণ পান্ডিত্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া কেশব কাশ্মিরী কর্তৃক প্রণীত **"বেদান্ত কৌস্তব প্রভা"** গ্রন্থ আরোও বিস্তৃত এবং বহুল বিচারপূর্ণ। শ্রীমাধব মুকুন্দ রচিত **"পরপক্ষ গিরিব্রজ"** গ্রন্থও পান্ডিত্যপূর্ণ।

শ্রী নিম্বার্ক এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্যগণের মূল কথা হল ঃ ব্রহ্ম হলেন ভগবান বাসুদেব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। আর তত্ত্ব বা পদার্থ হল তিনটি ঃ চিৎ

(জীব), অচিৎ (জগৎ) এবং ব্রহ্ম। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হলেও আবার অভিন্ন। এই তিনের মধ্যে ভেদ যেমন আছে, তেমনি এরা অভেদও। এই সম্প্রদায়ের দর্শন অনুযায়ী ভেদাভেদ আশ্রয় শ্রী কৃষ্ণই বেদান্তের বিষয়। আর শ্রী ভগবৎভাব-ভিত্তিক মোক্ষই (মুক্তি) আসল। ভক্তিই মুক্তির উপায় এবং ধ্রুব স্মৃতিই ভক্তি নামে অভিহিত। শ্রী রাধাকৃষ্ণই মূল উপাস্য। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য শ্রী পুরুষোত্তম প্রণীত **"বেদান্ত-রত্ন মঞ্জুষা টীকায়"** শ্রীমতি রুক্মিনী, সত্যভামা ও শ্রী রাধা মিলিত শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য বলে স্বীকৃত বা নির্ধারিত।

শ্রী নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন ব্যাখ্যার সময় তাঁর **"দশশ্লোকীতে"** মূলত উপরোক্ত বিষয়সমূহই তুলে ধরেছেন। এই দশশ্লোকীতে পাচটি বিষয়ের নির্দেশ দেখা যায়।

(১) উপাস্য (২) উপাসকের স্বরূপ (৩) সাধন ভক্তি (৪) ভক্তিরস (প্রেম লক্ষণা ভক্তি) এবং (৫) উপাস্য প্রাপ্তির অন্তরায় (মায়া)।

শ্রী মাধব মুকুন্দের **"পরপক্ষ গিরিব্রজ"** গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ প্রথমে শ্রী ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা চিত্তের সংস্কার করতে হবে। তারপর বৈরাগ্য সাধন ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হতে হবে। এ থেকে শ্রবণ, মনন, ইত্যাদি দ্বারা শ্রী ভগবানের স্বরূপাদি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এরূপ জ্ঞান লাভের পর ধ্যান এবং এতে সিদ্ধ হলে পরাভক্তি স্তরের ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হবে। এ অবস্থায় ভগবৎ অনুগ্রহে তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ হবে। তাহলেই মোক্ষ লাভ বা মুক্তি সম্ভব।

শ্রী নিম্বাদিত্যের হরিব্যাসদেব ও কেশব ভট্ট নামে দুই জন শিষ্য থেকে এই সম্প্রদায়ের দুই শাখার উৎপত্তি হয়েছে। এরা উদাসীন ও গৃহস্থ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

(i) শ্রী নারায়ন (ii) হংস বা ব্রহ্মা, (iii) সনকাদি চতুঃসন (ব্রহ্মার চার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার) (iv) শ্রী নারদ (v) নিম্বাদিত্য (vi) শ্রী নিবাস (vii) বিশ্বাচার্য (viii) পুরুষোত্তম (ix) বিলাস আচার্য (x) স্বরূপ আচার্য (xi) মাধব আচার্য (xii) বলভদ্রাচার্য (xiii) পদ্মাচার্য (xiv) শ্যামাচার্য (xv) গোপাল আচার্য (xvi) কৃপাচার্য (xvii) দেবাচার্য (xviii) সুন্দরভট্ট (xix) পদ্মনাভ ভট্ট (xx) উপেন্দ্র ভট্ট (xxi) রামচন্দ্র ভট্ট (xxii) বামন ভট্ট (xxiii) কৃষ্ণ ভট্ট (xxiv) পদ্মাকর ভট্ট (xxv) শ্রী শ্রবণ ভট্ট (xxvi) ভুরি ভট্ট (xxvii) মাধব ভট্ট (xxviii) শ্যাম ভট্ট (xxix) গোপাল ভট্ট (xxx) বলভদ্র ভট্ট (xxxi) গোপীনাথ ভট্ট (xxxii) কেশব ভট্ট (xxxiii) গোকুল ভট্ট (xxxiv) কেশব কাশ্মিরী প্রমুখ।

৪.৩ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কতিপয় বিখ্যাত আচার্য/বৈষ্ণব

নিম্বার্ক সম্প্রদায়েও কতিপয় বিখ্যাত আচার্য এবং গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকজনের জীবন ও দর্শন নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৪.৩.১ শ্রী কেশব কাশ্মিরী (দিগ্বিজয়ী পন্ডিত)

শ্রী সম্প্রদায়ের তেত্রিশ-তম গুরু শ্রী গোকুল ভট্টের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন **কেশব** কাশ্মিরী বা কেশব ভট্ট। ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে **জন্ম**।

ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে (বহরমপুর সংস্করণ) কেশব কাশ্মিরী সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"সরস্বতী দেবীর করিয়া মন্ত্রজপ।
হৈল সর্ব্ববিদ্যা-স্ফুর্তি বাড়িল প্রতাপ॥
সর্ব্বদেশ জয় করি দিগ্বিজয়ী খ্যাতি॥
কাশ্মির দেশস্থ অতিশিষ্ট বিপ্রজাতি॥
বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গনে।
হস্তী অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁর সনে॥

কথিত আছে কোন শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনার সময় কেশব কাশ্মিরীর কণ্ঠে **সরস্বতী দেবী অবস্থান করতেন**। নবদ্বীপে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাই কোথায়ও তিনি **কোন পন্ডিতের** নিকট শাস্ত্র বিষয়ে তর্কে পরাজিত হন নাই। এক সময় অবশ্য **নবদ্বীপে আগমন করতঃ** শ্রীমন মহাপ্রভুর সাথে সাহিত্য ও শাস্ত্র বিষয়ে বিচার করতে **গিয়ে তিনি পরাজয়** বরন করতে বাধ্য হন।

শ্রী কেশব কাশ্মিরী তাঁর **"বেদান্ত কৌস্তব প্রভা"** গ্রন্থে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দর্শন **দ্বৈতাদ্বৈতবাদের** অনেক বিষয়বস্তু অত্যন্ত পান্ডিত্যের সাথে তুলে ধরেন। তাঁর রচিত **অপরাপর** গ্রন্থের মধ্যে **লঘুকেশব, তত্ত্ব প্রকাশিকা** (গীতার টীকা), **গোবিন্দ শরণাগতি স্তোত্র, যমুনাস্তোত্র** ইত্যাদি প্রধান। তিঁনি কৌস্তুভ প্রভা গ্রন্থের মঙ্গলাচরনে **শ্রী মুকুন্দকে** এবং গীতাটীকার মঙ্গলাচরনে শ্রী গাঙ্গল ভট্টকে গুরুবুদ্ধিতে প্রণাম **করেছেন**।

উল্লেখ্য যে সরস্বতী দেবীর উপদেশে শ্রী কেশব কাশ্মিরী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরনাশ্রিত হয়েছিলেন। এই দিগ্‌বিজয়ী সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেনঃ "ইনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত ষড়দর্শনবেত্তা শ্রী কেশব ভট্ট।" তিনি **"ক্রমদীপিকা"** নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে শ্রী রাধা গোবিন্দের উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আছে।

৪.৩.২ শ্রী হরিব্যাসদেব

শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী শ্রী শ্রবন ভট্টের শিষ্য। তিঁনি শ্রী নিম্বার্কের **দশ শ্লোকীর ভাষ্য-সিদ্ধান্ত কুসুমাঞ্জলি, অর্থপঞ্চক, সিদ্ধান্ত রত্নাঞ্জলী, প্রেমভক্তি বিবর্ধিনী** এবং হিন্দি ভাষায় **মহাবানী পঞ্চরত্ন** ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী হয়েও শ্রী হরিব্যাসদেব তার সিদ্ধান্ত কুসুমাঞ্জলীতে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন কথিত **"বিশেষ"** শব্দ

স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে যে ভেদ রয়েছে তাই স্বীকার করেছেন। আবার শ্রী বলদেব বর্ণিত ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল (সময়) ও কর্ম এই পাচটি পদার্থও স্বীকার করে নিয়েছেন। তদুপরি স্বতন্ত্র এবং পরতন্দ্রভেদে তত্ত্বদ্বয়- ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পরমার্থিক স্তরেও ভেদ ইত্যাদি স্বীকার করে শ্রী হরিব্যাসদেব মূলতঃ সিদ্ধান্তে, শব্দে ও পরিভাষায় শ্রী বলদেবের গ্রন্থ **সিদ্ধান্তরত্নের** আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর গ্রন্থ কুসুমাঞ্জলি-এর কিছু কিছু জায়গায় তিনি এমনসব আলোচনা করেছেন যা নিম্বার্কের দর্শনকে অনেকটা তুচ্ছ করে দিয়েছে। ঐ গ্রন্থের উপসংহারে তিনি বলেন, **'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং সত্যং ভেদমপিব্রুবন। নিম্বার্কো ভগবান বিদ্‌ভিঃ সত্যবাদী নিগদ্যতে।'**

এছাড়াও সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব বিষয়ে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রী পুরুষোত্তম সহ কিছু আচার্যের মত অতিক্রম করে শ্রী হরিব্যাসদেব গৌড়ীয় সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করেছেন বলা যায়।

৪.৩.৩ শ্রী হরিদাস স্বামী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী সারস্বত ব্রাহ্মণ। মূলতানের অর্ন্তগত কোন এক গ্রামে-মতান্তরে উছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রী বৃন্দাবনের নিকটে রায়পুর গ্রামের শ্রী গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিবাহ করেন। পরবর্তীতে ২৫ বছর বয়সে বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করে বাঁকেবিহারী বা বঙ্কিম বিহারী শ্রী বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। প্রবাদ আছে তিনি শ্রী বৃন্দাবনের নিধুবনের বিশাখা কুন্ড থেকে শ্রী বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি শ্রী বৃন্দাবনের পরপারে মানস সরোবরের কুন্ডতীরে ভজনা করতেন। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রী বৃন্দাবনে গমন করলে তিনিও সেখানে বাস করেন।

শ্রী হরিদাস স্বামী সঙ্গীতবিদ্যায় সিদ্ধ গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত নামক জনৈক মহাত্মার কাছ থেকে নাদ বিদ্যা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ শ্রী তানসেন এই হরিদাস স্বামীর নিকট থেকে যৎকিঞ্চিৎ নাদ বিদ্যা শিক্ষা করে তৎকালীন সময়ে ভারতে অদ্বিতীয় সঙ্গীতজ্ঞ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মোঘল সম্রাট আকবর শ্রী হরিদাস স্বামীকে দর্শন করার জন্য যে শ্রী বৃন্দাবনে তানসেন সহ এসেছিলেন তার বিবরণ কিছু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে দিল্লী নিবাসী দয়ালদাস ক্ষেত্রী নামক জনৈক মহাধনী শ্রী হরিদাস স্বামীকে কতগুলো অমূল্যমণি দান করলে তিনি সেগুলো যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করেন এবং শ্রী দয়াল দাসকে যমুনার জলরাশির মধ্যে যে কত অমূল্য রত্ন পড়ে আছে তা দর্শন করান।

শ্রী হরিদাস স্বামী লিখিত হিন্দী ভাষায় **'সাধারণ সিদ্ধান্ত'** এবং **'রস্যকে পদ'** নামক দুটি গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রী বৃন্দাবনেই তিরোহিত হন এবং সেখানকার নিধুবনে তাঁর সমাধি আছে।

অধ্যায় ঃ পাঁচ

শ্রী রুদ্র সম্প্রদায় ⇒ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ

৫.১ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ কি ?

বেদের শিরোভাগ উপনিষদ বলে পরিচিত। উপনিষদ অবলম্বনে শ্রীল ব্যাসদেব **ব্রহ্মসূত্র** নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এটিই বেদান্ত দর্শন নামে বিখ্যাত। অনেক ঋষি এবং মনীষি এই দর্শনের ব্যাখ্যা নিজ নিজ বিচার বুদ্ধিতে দিয়েছেন। তার মধ্যে রুদ্রের বিচার অবলম্বনে শ্রী বিষ্ণু স্বামী ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সম্পর্কে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তাই শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত হয়।

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী পরব্রহ্ম সর্ব-ধর্ম বিশিষ্ট। তিনি সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ ও আনন্দময়), সর্বব্যাপক, অব্যয় (যার ক্ষয় নেই), সর্ব শক্তিমান, স্বতন্ত্র, নির্গুন (প্রাকৃত গুণ বর্জিত) দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছন্ন (অবিচ্ছিন্ন), সজাতীয়-বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ বর্জিত। নির্গুন হয়েও তিনি সগুন, নিরাকার হয়েও সাকার।

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মায়াকৃত নয়, এমনকি আরোপিতও নয়। নির্গুন ব্রহ্মের পক্ষে জগতের উপর কর্তৃত্ব অসম্ভব। আবার সগুন ব্রহ্ম পরতন্ত্র। পরতন্ত্রেরও কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। তাই ব্রহ্মের সর্ব কর্তৃত্ব স্বীকার করতেই হয়। ব্রহ্ম সূত্রের **জন্মাদাস্য যতঃ** (ব্রহ্মসূত্র ১/১/২) এবং শ্রী গীতার **'অহং সর্বস্ব জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা'** (গীতা ১০/৮) – বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম সম্পর্কে এরূপ মতেরই প্রতিফলন হয়েছে বলা যায়।

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী জীব হল চিৎকন, সুক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন, চিৎ প্রধান ও আনন্দস্বরূপ। জীব নিত্য। তবে এই নিত্যতা অলীক। মায়াবাদীরা (শ্রী শঙ্করাচার্য যে কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান দিক হল মায়াবাদ। তাই তাঁর অনুগামীদেরকে অনেকে মায়াবাদী বলেন) জীবকেই ব্রহ্ম বলেন (অর্থাৎ জীবই ভগবান)। তাদের মতে জীব হলেন বিভু (সর্ব ব্যাপক)। কিন্তু শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে জীবকে অনু (অতি ক্ষুদ্র সত্বাবিশিষ্ট) বিবেচনা করা হয়। জীবের কর্তৃত্ব আছে, জীব ভোক্তা, জীব ব্রহ্মের অংশ ইত্যাদি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদে আলোচিত হলেও জীব এবং ব্রহ্মের (ঈশ্বর) অভেদ কল্পিত হয়েছে। ব্রহ্ম চিৎ ও পূর্ণ আনন্দময়। আবার জীব তিরোহিতানন্দ (আনন্দময় হলেও জীব তিরোধান করে-অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পড়ে)। শুদ্ধ জীব (ভগবানের পরম ভক্ত) এবং ব্রহ্ম বস্তুত একই পদার্থ।

শ্রী শঙ্করাচার্যের মতে (কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ) ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বা অলীক। কিন্তু শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী এই জগতও সত্য এবং নিত্য।

ভগবদ্‌রূপও ভগবান থেকে অনন্য। শুদ্ধ অদ্বৈত বাদ অনুযায়ী ভক্তিই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

শ্রী রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী স্থুল এবং সুক্ষ্ম অচিৎ পদার্থ (জগৎ) প্রলয়েও সুক্ষ্ম আকারে অচিৎভাবেই বর্তমান থাকে। স্থুল এবং সুক্ষ্ম জীব সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী এই স্থুল ও সুক্ষ্ম পদার্থ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন নিত্য সত্য। আবার বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে সাষ্টি, সারুপ্য, সালোক্য ও সামীপ্য এই চার ধরনের মুক্তি স্বীকৃত। কিন্তু শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে এই চারটি সহ সাযুজ্য মুক্তিও বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.২ শ্রী বিষ্ণুস্বামী এবং রুদ্র সম্প্রদায় ও শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ

রুদ্র থেকে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে। এর প্রথম আচার্য হলেন শ্রী বিষ্ণুস্বামী। তিনি বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে রুদ্রের বিচার অবলম্বন করে জগতে বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচার করেন। শ্রী বিষ্ণু স্বামী সর্বজ্ঞ মুনি নামেও পরিচিত/অভিহিত ছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পান্ড্যদেশে পাডু বিজয় নামক রাজার বিষ্ণু ভক্ত পুরোহিত দেবেশ্বরের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন। সংসার আশ্রমে তার নাম ছিল দেবতনু। সন্যাস গ্রহণের পর বিষ্ণুস্বামী (সর্বজ্ঞ মুনি) নামে অভিহিত/পরিচিত হন **(শ্রী হরিদাস দাস ঃ শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ২০৬৪)**। আবার অন্যমতে সর্বজ্ঞ মুনি শঙ্করাচার্যের কয়েক শত বছর পূর্বে ভারতের দাক্ষিনাত্যের মাদুরা জেলার কল্যাণপুর গ্রামে আবির্ভূত হয়েঁ পরবর্তীতে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন **(শ্রী হরিকৃপা দাস : পরম গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, পৃঃ ১৬৫)**।

শ্রী বিষ্ণুস্বামী বেদ বিরোধী বৌদ্ধগণের সনাতন ধর্ম বিলোপ করার অপচেষ্টা লক্ষ্য করে শ্রুতিশাস্ত্রের (উপনিষদ) সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রচার করেন। এই ভাষ্যই **"সর্বজ্ঞ সুক্ত"** নামে পরিচিত। এতে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করা হযেছে।

শ্রী বিষ্ণু স্বামী নিজেকে রুদ্রের অনুগত এবং নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণুর উপাসক বলে স্বীকার করেছেন। শ্রী শিহ্লিন মিশ্র বা শ্রী বিল্ব মঙ্গল, শ্রীধর স্বামী এবং তার গুরুভাই শ্রী লক্ষীধর প্রমুখ এই সম্প্রদায়ী বলে জানা যায়। মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের ন্যায় রুদ্র সম্প্রদায়ও যে প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রুদ্র সম্প্রদায়ের মতবাদে পরবর্তীকালে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায় ৪৭০/৪৭৫ বছর পূর্বে শ্রীবল্লভাচার্য এই সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আচার্য পদবী লাভ করেন বলে **বল্লভাচারী** নামেও এই সম্প্রদায় খ্যাতি লাভ করেছে। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর মত থেকে এই বল্লভাচার্যের প্রস্তাবিত শ্রী বিষ্ণুস্বামীর মত পৃথক **(দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী হরিকৃপা দাস ঃ পূর্বোক্ত)** । এই বল্লভ সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তম মহারাজ, শ্রীব্রজনাথ প্রমুখ পন্ডিতগণ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য **প্রমেয় রত্নার্নব** ইত্যাদি গ্রন্থে যে সব বিচার প্রদর্শন করেছেন তাতে সর্বজ্ঞ মুনির প্রাচীন শুদ্ধ অদ্বৈত মত পুরাপুরি পাওয়া যায় না। শ্রী বল্লভাচার্য স্বয়ং প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর অধঃস্তন শ্রীধর স্বামী পাদের বিচার প্রণালী থেকে পৃথক হয়ে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ নিরসনে/খন্ডনে বিভিন্ন অনুভাষ্য রচনা করেন। এই অনুভাষ্যে সর্বজ্ঞ মুনির প্রাচীন শুদ্ধ অদ্বৈত মতের কথা কোন কোন স্থানে অসম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রী বল্লভ নিজের শিষ্যগণের মধ্যে নিজেকে ভগবৎ অবতার বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন। তিনি নিজেকে শ্রী বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায়ের রক্ষক বলে অভিমান করতেন। এই সম্প্রদায়ের আচার্যগণের মধ্যে পবিত্রতা থাকলেও কেউ কেউ বাউলদের ন্যায় নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করে।

"মারুত শক্তি" নামক টীকা গ্রন্থে উপরোক্ত মতের রুদ্র সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালী এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ শ্রী পুরুষোত্তম হরি ⟹ শ্রী নারদ মুনি ⟹ শ্রীল ব্যাসদেব ⟹ শ্রীল শুকদেব ⟹ বিষ্ণুস্বামী ⟹ দ্রবিড় ⟹ বিল্বমঙ্গল ⟹ বল্লভাচার্য প্রমুখ।

মথুরা, বৃন্দাবন ও কাশীতে রুদ্র সম্প্রদায়ের মন্দির রয়েছে। উদয়পুরের নিকটবর্তী শ্রীনাথ দ্বারে শ্রীমন মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর প্রকটিত শ্রী গোপালদেব এখন এই সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হচ্ছেন। পুষ্টিমার্গ এবং মর্যাদামার্গ ভেদে এদের উপাসনা প্রণালী দুই প্রকার।

৫.৩ রুদ্র সম্প্রদায়ের কতিপয় বিখ্যাত আচার্য/বৈষ্ণব

রুদ্র সম্প্রদায় বেশ প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ের কতিপয় বৈষ্ণবাচার্যের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিচে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৫.৩.১ শ্রী বিল্ব মঙ্গল (লীলা শুক বিল্ব মঙ্গল)

ভারতের দাক্ষিনাত্যের কৃষ্ণবেন্না নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পন্ডিত। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। তিনি একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন। পূর্ব জন্মের কুবাসনার কারণে বিল্ব মঙ্গল ঐ নদীর পূর্ব তীরে বসবাসরতা চিন্তামণি নামের এক বেশ্যার সঙ্গ করেন।

তিনি ঐ বেশ্যা রমনীর প্রতি এতটাই আসক্ত হয়েছিলেন যে বর্ষাকালের অন্ধকারময় রজনীতে নিজের পিতৃ শ্রাদ্ধ দিবসেও প্রচুর বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে একটি মৃতদেহ অবলম্বন করে উত্তাল তরঙ্গ নদী পার হন এবং গভীর রাতে চিন্তামনির গৃহদ্বারে উপস্থিত হন। কিন্তু চিন্তামনির দ্বার রুদ্ধ (বন্ধ) দেখতে পান। তখন গৃহের ভিত্তি-গর্ত্তে তৈরিকৃত অদ্ধপ্রবিষ্ট সর্পের পুচ্ছ (লেজ) অবলম্বন করে গৃহপ্রাচীর (গৃহের দেয়াল) লংঘন করে নিপতিত হয়ে মুর্চ্ছিত (সংজ্ঞাহীন) হয়ে পড়েন। তার পতিত হওয়ার শব্দ শুনে চিন্তামনির দাসীগণ অনুসন্ধান করে দেখতে পেল যে এত রাতেও বিল্বমঙ্গল এসেছেন এবং প্রাচীর লংঘন করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। চিন্তামনি ও তার দাসীগণ সেবা শশ্রুষা করে বিল্বমঙ্গলকে সুস্থ্য করে তোলেন। এরপরই চিন্তামনি কোনরকম সংকোচ না করে বলেছিলেন, **"হে ব্রাহ্মণ কুমার! আমার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা, তুমি যদি ভগবানের জন্য এরূপ ব্যাকুল হতে, তবে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা পেতে।"** বিল্ব মঙ্গল ঐ রাত সেখানে অবস্থান করে পরদিন ভোরে নিকটবর্তী সোমগিরি গুরুর আশ্রমে যেয়ে তাঁর নিকট দীক্ষিত হন এবং শ্রী গুরু প্রদত্ত নাম হয় লীলাশুক। এরপর কিছুদিন সেখানে অনন্যভাবে শ্রী গুরুর সেবা করতঃ ব্যাকুল হয়ে কয়েকজন সঙ্গীসহ শ্রী বৃন্দাবনে যাত্রা করেন।

শ্রী বৃন্দাবনে যাওয়ার পথেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর মুখ থেকে ক্রমে ক্রমে অনেক শ্লোক নির্গত হয়। ঐ সব শ্লোক তাঁর সঙ্গীরা ধারন করেন। পরবর্তীতে সেগুলো নিয়েই তাঁর **শ্রীকৃষ্ণ কর্নামৃত** নামক গ্রন্থ রচিত হয়।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে **অখিল রসরাজ** হিসাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁকে **মধুরং মধুরং মধুরম** বলে আখ্যায়িত করেছেন।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো।
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেত দহো।
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম।
(কৃষ্ণ কর্ণামৃত)।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"কর্নামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য, মাধুর্য, কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে যে কর্নামৃত পড়ে নিরবধি॥"
(চৈ. চ. মধ্য ৯/৩০৭-৮)।

উল্লেখ্য যে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর গম্ভীরা লীলার সময় সর্বদা এই গ্রন্থের লীলা আস্বাদন করেছিলেন।

৫.৩.২ শ্রীধর স্বামী (১৩৫০ – ১৪৫০) শ্রীধর স্বামীপাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহ্য ও কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন তিনি ভারতের গুজরাট প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। আবার অন্যেরা বলেন, ইনি শ্রী লালদাসকৃত ভক্তমালে উল্লিখিত **ভট্ট কাব্য** রচয়িতার জনক। অন্যমতে তিঁনি অদ্বৈত মতাবলম্বী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রী বল্লভাচার্যও তাই বলেছেন।

কিন্তু শ্রীধর স্বামীপাদ কখনো কেবলাদ্বৈতবাদী (শঙ্করচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ) ছিলেন না। তিনি বরং শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ মতে বস্তুর বা ঈশ্বরের অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য হল জগৎ। এজন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ এই তিনটি বস্তু হল শব্দবাচ্য। শ্রী মদ্ ভাগবতের **"বেদ্যং বাস্তবমবস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মুলনম্"** – এই চরনের টীকায় শ্রী ধর স্বামীপাদ বলেন, **"বাস্তব শব্দেন -বস্তুনোহংশো জীবোবস্তুনঃ শক্তি মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্তেব ন তত্তঃ পৃথক।"** তিনি যে কখনো কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না – এই বাক্যের মাধ্যমে তা বেশ বুঝা যায়।

শ্রী ধর স্বামীপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের **"ভাবার্থদীপিকা টীকায়"** অন্য কোন আচার্যের নাম উল্লেখ না করে কেবলমাত্র শ্রী বিষ্ণু স্বামীর নাম উল্লেখ করেছেন। শ্রী নাভাদাসজীর ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে জানা যায় বিষ্ণু স্বামীর পরমানন্দ নামে একজন অধস্তন ছিলেন। পরম্পরাক্রমে এই পরমানন্দই হলেন শ্রীধর স্বামীর গুরুদেব। শ্রী ধর স্বামীপাদ তার শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে লিখেছেন ঃ **"যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"**

শ্রীধর স্বামীর গুরু ভাইয়ের নাম ছিল শ্রী লক্ষ্মীধর স্বামী। এই লক্ষ্মীধর স্বামীই **শ্রীনাম কৌমুদী** নামক গ্রন্থের লেখক। শ্রীধর স্বামী যদি কেবলাদ্বৈতবাদী হতেন তবে শ্রীমন মহাপ্রভু তাঁকে জগৎগুরু বলে মেনে নিতেন না। শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ তাঁকে ভক্তের রক্ষক বলে আখ্যা দিতেন না।

শ্রীধর স্বামীপাদ শ্রী নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন। তিনি হরি-হরকে অভিন্ন জেনেও শ্রীমাধবকেই স্বয়ংরূপ ভগবান বলে জানতেন। কাশীতে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি শ্রী বিন্দু মাধবের সন্তোষ বিধানের জন্য শ্রী চিৎ সুখাচার্যের (গৌড়েশ্বর আচার্য শ্রী জ্ঞানোত্তমের শিষ্য।) ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে বিষ্ণুপুরানের আত্মপ্রকাশ টীকা

রচনা করেছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের ভক্তগনের অনুরোধে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের **ভাবার্থদীপিকা** টীকা প্রণয়ন করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলী হল নিম্নরূপ।

(i) শ্রী ভাগবত টীকা ⟹ ভাবার্থ দীপিকা।

(ii) শ্রী বিষ্ণুপুরান টীকা ⟹ আত্মপ্রকাশ।

(iii) শ্রী গীতার টীকা ⟹ সুবোধিনী।

(iv) সনৎসুজাতীয়ের টীকা ⟹ বালবোধিনী।

(v) গীতাসার টীকা ⟹ ব্রহ্ম সম্বোধিনী।

(vi) ব্রজবিহার কাব্য।

শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপায় সর্ববেত্তা শ্রীধর স্বামীপাদ সমগ্র শ্রীমদ্ ভাগবতের যে টীকা রচনা করেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করে সেটির আদর্শে শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকা রচনা করতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছেন ঃ

"শ্রীধর স্বামী প্রসাদে সে ভাগবত জানি।
জগৎগুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি।
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ।।"

(চৈ. চ. অন্ত্য ৭/১২৯, ১৩১)।

তাই এক অর্থে বলা যায় শ্রীল সনাতন এবং শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীধর স্বামীপাদের আনুগত্যেই পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীধর স্বামী নিজ সম্প্রদায়ের ভক্তদের অনুরোধে পূর্বের পর্যায় বা পরম্পরা অনুসরণ করে বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের **ভাবার্থদিপীকা** টীকা রচনা করেন। এই টীকায় ভেদাভেদ শব্দের সমর্থনে তিনি ভক্তি, শাস্ত্র ও জীবের নিত্যতা এবং জগতের সত্যতা প্রতিপাদন করেন। আবার একই সাথে কেবলাদ্বৈতবাদ বা প্রচ্ছন বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি শ্রী বিষ্ণু স্বামীর সর্বজ্ঞসুক্তের প্রমান উদ্ধার করেন। আবার শ্রীধর স্বামী কৃত **বিষ্ণুপুরানের টীকায়** কেবলাদ্বৈত মত খণ্ডন করে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভাগবত টীকায় তিনি ভক্তি, ভগবান ও ভক্তের নিত্যতা, জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য, মুক্তির প্রাসঙ্গিকতা, নির্ভেদ মুক্তির নিন্দা এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্তির নিত্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

মায়াবাদীরা (শঙ্করাচার্যের অনুসারীগণ) নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরতত্ত্ব বললেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, **'ঘনীভূত ব্রহ্ম'** বলেছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীরা ভগবানের শ্রী বিগ্রহ, নাম, রূপ, গুণ, বিভূতি, ধাম ও পরিকরের (শুদ্ধ ভক্ত বা পার্ষদ) নিত্যতা স্বীকার না করলেও তিনি শ্রী বিগ্রহ যে সনাতন ও অপরিমেয় তার সত্যতা স্থাপন করেন।

৫.৩.৩ শ্রী বল্লভাচার্য (বল্লভ ভট্ট)[১৪৭৯-১৫৩১]

শ্রী বল্লভ ভট্টের পিতার নাম লক্ষ্মন ভট্ট এবং মাতার নাম শ্রীযল্লমাগারু। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাক্ষ্মন। তিনি শ্রী কাশীধামের হনুমানঘাটে বসবাস করতেন। বিধর্মীগণ কর্তৃক কাশী আক্রমনের কথা শুনে লক্ষ্মণভট্ট সাতমাসের গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে নিজ দেশ তৈলঙ্গে পলায়নকালে ভারতের মধ্য প্রদেশের চম্পারণ্য নামক স্থানে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে শ্রী বল্লভ ভট্টের আবির্ভাব হয়। পরে একসময় আবার তারা কাশীতে ফিরে আসেন। ছোট বেলায় বল্লভ কাশীধামে শ্রী মাধবেন্দ্র সন্যাসীর কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভারতের দাক্ষিনাত্যে তীর্থ ভ্রমণকালে তিনি বিজয়নগরে নিজের মামাবাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখানকার রাজ সভায় তিনি আচার্য শ্রী ব্যাসতীর্থের সাথে মিলিত হন। শ্রী বল্লভ সেখানে মায়াবাদী বক্তব্য খণ্ডন করে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ স্থাপন করলে বিজয়নগরের তৎকালীন রাজা শ্রী কৃষ্ণদেব শ্রী ব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বে বল্লভ ভট্টের কনক (স্বর্ন) অভিষেক করে তাঁকে আচার্য পদবী প্রদান করেন।

দিগ্‌বিজয়ে বের হয়ে আচার্য বল্লভ তিন বার ভারবতবর্ষ ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার পর্যটনকালে কাশীতে তিনি বিবাহ করেন। গৃহস্থ হয়ে কাশীধামে অবস্থান করা অসঙ্গত বিবেচনা করে তিনি প্রয়াগের নিকট আড়াইল গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। তীর্থ পর্যটনের এক পর্যায়ে তিনি ব্রজের শ্রী গোবর্দ্ধনে আগমন করেন। সেখানে পূর্ণমল্ল নামক এক বণিক শিষ্যের সহায়তায় শ্রী গোবর্দ্ধন গিরির উপর এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। এরপর কাশীতে আগমন করে সেখানকার মায়াবাদী সন্যাসীগণকে শাস্ত্রীয় যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে আবার শ্রী গোকুলে বাসস্থান নির্মাণ করে গোবর্দ্ধনস্থ নতুন মন্দিরে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীর আবিস্কৃত শ্রী গোপালদেবকে পুনঃস্থাপন করেন। এরপর সস্ত্রীক আড়াইল গ্রামে আগমন করলে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম পুত্র গোপীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুত্র বিট্ঠলনাথ চরনাদ্রিতে আবিভূর্ত হন। আড়াইলে অবস্থানকালেই আচার্য বল্লভ শ্রীপাদ ভাগবতের দশম স্কন্দের টীকা শেষ করে একাদশ স্কন্দের টীকা আরম্ভ করেন।

শ্রীমন মহাপ্রভু যখন শ্রী বৃন্দাবনে গমন করেন তখন বল্লভ আচার্যের সাথে উক্ত আড়াইল গ্রামে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং পরিচয় হয়। বল্লভাচার্য মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে আমন্ত্রন করে তাঁর পাদ প্রক্ষালন করে পরিবার পরিজনসহ ঐ জল পান করেছিলেন। তিনি প্রভুকে দিব্য আসনে বসিয়ে নতুন কৌপিন এবং বর্হিবাস প্রদান করেন (চৈ. চ. মধ্য ১৯)।

শ্রী বল্লভাচার্য পূর্বে রুদ্র সম্প্রদায়ী শ্রী বিষ্ণুস্বামীর অনুগত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই সম্প্রদায় থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। তার মতবাদের অনুসারীগণ বল্লভী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। কথিত আছে তিনি ৮৪ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তার মধ্যে নিম্নোক্তসমূহ প্রধান বলে বিবেচনা করা যায়।

(i) ব্রহ্মসূত্রানুভাষ্য (ii) ভাগবত টীকা সুবোধিনী (iii) তত্বার্থদীপনিবন্ধ (iv) ষোড়শ গ্রন্থ (v) শিক্ষাশ্লোক (vi) শ্রুতিগীতা (vii) মথুরা মাহাত্ম (viii) মধুরাষ্টক (ix) পুরুষোত্তম নাম-সহস্র (x) পরিবৃঢ়াষ্টক (xi) নন্দকুমারাষ্টক (xii) পঞ্চশ্লোকী (xiii) গায়ত্রী ভাষ্য ইত্যাদি । বল্লভাচার্যের মতে ভক্তিমার্গ দুই প্রকার ঃ (ক) মর্যাদা (বৈধী) এবং পুষ্টি (রাগানুগা)।

শ্রী বল্লভাচার্যের মনে পান্ডিত্যের গর্ব ছিল। পুরীধামে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি মহাপ্রভুকে প্রতিদিন দর্শন করতে আসতেন। নিজ জ্ঞানের গর্বে গর্বিত হয়ে বল্লভাচার্য মাঝে মাঝে মহা প্রভুকে নানা প্রশ্ন করতেন। পরিশেষে পরাজিত হতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের গর্ব চূর্ণ করে অবশ্য তাকে তাঁর শ্রীচরণে পরে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

বল্লভাচার্য কিরূপ গর্বিত ছিলেন তার দুটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ (১) একদিন পুরীধামে তিনি শ্রী অদ্বৈত প্রভুকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কৃষ্ণ যখন আপনাদের স্বামী তখন তাঁর নাম কেন উচ্চারণ করেন? এ কথায় মহাপ্রভু উত্তর দেন ঃ স্বামীর আজ্ঞাই বলবতী। স্বামী তাঁর নাম অবিরাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন।

(২) অন্য একদিন বল্লভাচার্য বলেছিলেন ঃ আমি স্বামীর (শ্রীধর স্বামীর) ভাগবতের ব্যাখ্যা মানি না। তখন শ্রী মন্ মহাপ্রভু রহস্য করে বলেছিলেন ঃ স্বামীকে যিনি না মানেন তিনি বেশ্যা। অর্থাৎ পূর্বতন আচার্যগনের ব্যাখ্যা অধস্তনরা না মানলে তিনি পতিত বলে বিবেচিত হন।

শ্রী বল্লভাচার্য বাৎসল্য-ভাবের উপাসক ছিলেন। তিনি বালগোপালের উপাসনা করতেন। এক সময় শ্রী গদাধর পণ্ডিতের কাছে বল্লভাচার্য মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং বালগোপালের উপাসনা ত্যাগ করে শ্রী রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনায় রত হয়েছিলেন। বল্লভ আচার্যের শিষ্য ও অনুগামীগণ অবশ্য পূর্বের মতকেই ধরে রাখেন।

শ্রী বল্লভাচার্য নিজের পুত্র বিট্ঠলেশ্বরকে শ্রী মন্ মহাপ্রভুর চরণে অর্পন করেছিলেন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কাশীর হনুমান ঘাটে শ্রী বল্লভাচার্য অপ্রকট হন।

অধ্যায় ঃ ছয়

শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় ⟹ অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ

৬.১ অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ কি?

পরতত্ত্বের (ঈশ্বর বা ভগবান) শক্তিসমূহ এবং তার শক্তিতে পরিণত বস্তুসমূহের (জীব ও জগৎ)সাথে ঐ পরতত্ত্বের যে অচিন্ত্য (অপৌরুষেয় শব্দগম্য কিন্তু পুরুষের অর্থাৎ জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা শক্তি বা যুক্তিতর্কের অগম্য বা অতীত) যুগপৎ (একই সাথে) ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধ তাকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ বলা হয়। অচিন্ত্য শব্দের অর্থ চিন্তার অতীত-অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয় ও যুক্তি তর্কের সাহায্যে কোন কিছু সম্পর্কে ধারনা না পাওয়া গেলে তাকে অচিন্ত্যনীয় বলা হয়। ভেদাভেদ বলতে ভেদ (পার্থক্য) এবং অভেদ (অভিন্ন) বুঝায়। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন তত্ত্বের মধ্যে যে ভেদ ও অভেদ রয়েছে তা মানুষের জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত। কেবলমাত্র চিন্ময়-চেতনা এবং ভগবানের কৃপা হলেই এরূপ ভেদাভেদ অনুভব করা সম্ভব। এই দর্শন বা মতবাদকেই অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ বলা হয়। অন্য কথায় ভেদ ও অভেদের সহ অবস্থান ও স্থিতি এবং উভয়ই সমানভাবে সত্য ও নিত্য এটি অবোধ্য বা অচিন্ত্যনীয় বলে মানুষের যুক্তি বা ধারণায় প্রতীয়মান না হলেও (বুঝা সম্ভব না হলেও) শাস্ত্রে উপদিষ্ট ও বর্ণিত বলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

শ্রীমন মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রী সার্বভৌম পণ্ডিতের নিকট, কাশীতে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী সহ ষড়গোস্বামীকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃত ও বৈষ্ণব তোষনীতে, শ্রীল রূপ গোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে এবং শ্রীল জীব গোস্বামী ষটসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনীতে শ্রীমন মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা করে এর প্রচার করেছেন। এঁদের মধ্যে আবার শ্রীল জীব গোস্বামী এই বাদ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী জীব এবং প্রকৃতিকে তত্ত্ব বলেন নাই। এদেরকে শক্তিরূপে বর্ণনা করে পরতত্ত্বের (ঈশ্বর তত্ত্বের) অদ্বয়তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। পরতত্ত্বকে শক্তিহীন বা নির্বিশেষ বললে সর্বশক্তিমানের (ঈশ্বরের) পূর্ণতার হানি হয়। এজন্য শ্রীল জীবপাদ সর্বশক্তিমান পরতত্ত্বকেই পরব্রহ্ম বলেন। যিনি নিজে বৃহৎ এবং যাঁতে অপরকেও বৃহৎ করবার স্বরূপ অনুবৃংহণী শক্তি (স্বরূপ শক্তি বা নিজস্ব শক্তি) আছে তিনিই ব্রহ্ম।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় শক্তি আছে বলেই ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। এজন্য তাঁর শক্তিকেও অদ্বিতীয় বলা যায়-অর্থাৎ এই শক্তিও সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। এই শক্তির তিন ধরনের বৈচিত্র বা রূপ আছে ঃ সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। শক্তিভাবে ক্রিয়ার মাধ্যমেই ব্রহ্মের সবিশেষভাব প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের শক্তি দুইভাবে অবস্থান করে।

১. কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত (অপ্রকাশিত)।

২. শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত (প্রকাশিত)।

শ্রী ভগবানের ধাম এবং পরিকরগণ (পার্ষদগন) তাঁর স্বরূপ শক্তির প্রকাশ। অমূর্ত শক্তিরূপে শক্তিসমূহ ভগবানের বিগ্রহের সাথে একাত্ম হয়ে অবস্থান করেন। আর মূর্ত্তরূপে শ্রী ভগবানের ধাম ও পরিকররূপে প্রকট (প্রকাশিত) থাকেন। আর স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী শ্রী ভগবানে বা পরতত্ত্বেই অবস্থান করেন। এক কথায় হ্লাদিনী শক্তি শ্রী ভগবানের মধ্যেই অর্ন্তভুক্ত থাকেন। পরতত্ত্ব (শ্রী ভগবান) যখন রস আস্বাদনের লক্ষ্যে ঐ হ্লাদিনী শক্তির সর্ব আনন্দময়ী বৃত্তিকে (ভক্তিকে) তার শক্তির অংশ স্বরূপ ভক্তগনের হৃদয়ে সঞ্চার করেন তখন সেই বৃত্তি (ভক্তি) কৃষ্ণপ্রীতি রূপে বৈচিত্র ধারণ করে চমৎকারিত্ব লাভ করে।

ভক্তি হল ভক্ত এবং ভগবানকে বিগলিতকারী এক ধরনের শক্তি। এই কারণে সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজন তত্ত্বে শ্রীল জীব গোস্বামী অদ্বিতীয় সৎ-চিৎ আনন্দময়ী স্বরূপ শক্তির বৈচিত্র ও বিলাস স্বীকার করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে সম্বন্ধতত্ত্ব (ভগবৎতত্ত্ব) এক তথা অদ্বিতীয়। তিনি উপাসকের শ্রেণীভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎরূপে আবির্ভূত অদ্বয়–জ্ঞান তত্ত্ব। তিনি অদ্বয় বলে সজাতীয় ও বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ শুন্য। অর্থাৎ পরতত্বে দেহ-দেহী, প্রকাশ, বিলাস ও বৈভবের মধ্যে কোন জড়ীয় ভেদ নেই। কারন তা স্বরূপ-শক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়। প্রকাশ ও বিলাস ইত্যাদিতে কেবল শক্তি প্রকাশের পার্থক্যহেতু (তারতম্যে) লীলাবৈচিত্র পরিদৃষ্ট হয়। আবার এই অদ্বয় তত্ত্ব পাওয়ার/সাক্ষাতের উপায়ও অদ্বিতীয় স্বরূপশক্তির প্রতি ভক্তি। ভক্তিই পরমাত্মার অনুশীলন বা যোগ। ভক্তি থেকে যারা কালকে পৃথক করে-অর্থাৎ জ্ঞানকে পৃথক অভিধেয় বা উপায় মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে লাভের চেষ্টা করেন তারা শেষ পর্যন্ত নানা ধরনের ক্লেশ, দুঃখ, কষ্টাদি লাভ করেন। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয়, কৃষ্ণভক্তিও সেরূপ জ্ঞান-কর্ম যোগের আশ্রয়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে প্রয়োজন তত্ত্বও অদ্বিতীয়। কারণ কেবলমাত্র প্রীতি বা বিমুক্তিই প্রয়োজন। এর মধ্যেই যোগির কৈবল্য ও জ্ঞানীর মুক্তি। কৈবল্য ও মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টাই কৈতব (এক ধরনের আত্মপ্রতারণা)। গৌড়ীয় দর্শনে শক্তি

ও শক্তিমান মিলেই এক অখণ্ড অদ্বয় বস্তু বা তত্ত্ব। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বা এরূপ শক্তির অলৌকিকতা নিরূপনে অচিন্ত্য শব্দের প্রয়োগ একমাত্র গৌড়ীয় দর্শনেই দেখা যায়।

শ্রী রামানুজ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ স্বীকার করেন। কারণ পর ব্রহ্মের শক্তি সনাতন ও স্বাভাবিক। কিন্তু শক্তি স্বরূপ-অনুবন্ধিনী। শ্রী মধ্বাচার্যও পাচ ধরনের ভেদ স্বীকার করেন ঃ জীবে-ঈশ্বরে, জীবে-জীবে, জড়-জীবে, জড়ে-জড়ে, জড়-ঈশ্বরে। এই পঞ্চভেদ নিত্য, সত্য ও অনাদি।

বস্তুত ঃ ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ে স্বরূপ ও সামর্থ্যের দিক থেকে সব সময়ই ভিন্ন। কারণ বিভু শক্তি হলেন ব্রহ্ম, আর অনু শক্তি হল জীব (আত্মা)। চৈতন্যের দিক থেকে উভয়েই অভিন্ন। অথচ স্বরূপ ও সামর্থ্যের আলোকে চিরদিন (সর্বদাই) ভিন্ন।

পরব্রহ্মের স্বরূপ অনুবন্ধিনী শক্তি হল তাঁর স্বাভাবিক শক্তি, অন্য কিছু থেকে উদ্ভূত বা সৃষ্ট নয়। অগ্নিদগ্ধ লোহার মধ্যে যে দহন শক্তি উৎপন্ন হয় সেটি লোহার নিজের শক্তি নয়, বরং এটি সৃষ্ট বলা যায়। এক্ষেত্রে অগ্নি এবং তার দহন শক্তি আপাততঃ অভিন্ন হলেও সব সময় এবং সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ অগ্নি না দেখলেও এর তাপ কোন কোন সময়/পরিস্থিতিতে অনুভব হতে পারে। তেমনি পরব্রহ্ম যদি দৃশ্যমান নাও হন তবুও তাঁর শক্তির আভাস অনুভব বা গোচর হয়। তাই অগ্নি ও এর দহন শক্তি যেমন তেমনি পরব্রহ্ম ও তার শক্তি সম্পূর্ণ অভেদ-সেটি নিরূপন হয় না। এদের মধ্যে কিছুটা ভেদ অতি সুক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা যায়। আবার পুরাপুরি ভেদ (পার্থক্য) আছে একথা বলাও কঠিন।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত এবং শিক্ষায় অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ -এর বিষয়টি প্রতিফলন হয়েছে। শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলায় বলেছেন ঃ

> 'রাধা – পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
> দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমান।
> মৃগমদ তার গন্ধ-যৈছে অবিচ্ছেদ।
> অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
> রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
> লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥'

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোর তাৎপর্য হল এই যে পূর্ণ শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধা এবং পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ এই দুই একই। আবার প্রয়োজনে একে দুই হন। অনাদিকাল থেকে এই উভয় বিগ্রহ স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়েও লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই দেহ ধারণ করেন। দুই দেহ এক হলে শ্রী গৌরস্বরূপ। এটি হল ভাবের লীলা। ভাব

আস্বাদনের জন্য দু'জন এক হয়ে যান। আবার যখন তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রস আস্বাদনের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা জাগে তখন তাঁরা হন শ্রী রাধাকৃষ্ণরূপে দুই বিগ্রহ। উভয় লীলাই যুগপৎ নিত্য। এই লীলাই অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের আসল স্বরূপ।

৬.২ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং গৌড়ীয় দর্শন

তৎকালীন ভারতবর্ষের কতিপয় আচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রবর্তনের সমকালেই তৎকালীন বঙ্গদেশেও এক অভিনব ধর্মজাগরন এসেছিল। নদীয়ার শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরই ঐ আন্দোলনের মুখ্যতম নেতা হন। পুরাতন ও নুতনের, এক ও বহুতে, অনুকূল ও প্রতিকূলে এক অচিন্ত্য এবং অতি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি বেদান্তদর্শনের এক মীমাংসা স্থাপন করতে সমর্থ হন। স্বয়ং ভগবান মহাবতারী শ্রী গৌরাঙ্গ নিজে কোন বেদান্ত ভাষ্য প্রনয়ন করেন নাই। অবশ্য এরূপ কাজ তাঁর নয় বা তিনি প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। কারণ তাঁর মতে শ্রী মদ ভাগবতই ব্রহ্ম সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

শ্রী মদ্ ভাগবতই ব্রহ্ম সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। এটি স্বতঃসিদ্ধ। এই ভাষ্যের সমান্তরাল ব্রহ্মসূত্রের অপর কোন ব্যক্তিগত ভাষ্য তাই অকৃত্রিম এবং আসল হতে পারে না। কেবলমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুগত ভাষ্য আদরনীয় হতে পারে। এজন্যই দেখা যায় শ্রী গৌরাঙ্গের অতি নিকটতম কোন পার্ষদ বেদান্তসূত্রের কোন ভাষ্য প্রণয়নে প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভু তৎকালীন সময়ের প্রধান প্রধান বেদান্তিগনের কাছে অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদই প্রচার করেছেন। যেমন কাশীধামে বিখ্যাত মায়াবাদী পণ্ডিত শ্রী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, পুরীধামে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক (ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত) শ্রী বাসুদেব সার্বভৌম প্রমুখের নিকট তিনি বেদান্তসূত্রের অভিনব ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এসব সিদ্ধান্ত শ্রীল সনাতন প্রভুসহ অন্যেরা তাদের নিজ নিজ রচিত গ্রন্থে কিছু কিছু উল্লেখ করেন। তবে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুই তাঁর **ক্রমসন্দর্ভ, ষটসন্দর্ভ** এবং বিশেষ করে **সর্বসম্বাদিনী** গ্রন্থে ঐসব বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। পাঠকবর্গ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের (মধ্য ৬/১৩৩-১৭৫ এবং ২৫/৮৯-১৪৬) বিভিন্ন পয়ারসমূহ ভালমত অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবেন যে, শ্রী মন্ মহাপ্রভু কিভাবে অতি সহজ ভাষায় বেদান্তের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু মীমাংসা করেছেন। এই বিচার-ধারাই গৌড়ীয় গোস্বামীগণের সব গ্রন্থে অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে গৌড়ীয় দর্শন এবং মহাপ্রভুর মত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

(১) প্রথমত ঃ ব্রহ্ম শব্দের তাৎপর্য বিচারে এর মুখ্য (প্রধান বা আসল) অর্থ **হল বৃহত্তম**-অর্থাৎ জ্ঞান-বল-ক্রিয়া-শক্তি সমন্বিত তত্ত্ব। সুতরাং অন্যকেও বৃহৎ করার **শক্তিযুক্ত বস্তুই** ব্রহ্ম। অন্য কথায় বলা যায় বৃংহ-ধাতু নিষ্পন্ন ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা নিত্য **শুদ্ধ-মুক্ত**-স্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্ব শক্তি যুক্ত বস্তুকে বুঝায়। তাই ব্রহ্ম হলেন সবিশেষ **তত্ত্ব**। কারণ সর্বজ্ঞ, রস, আনন্দ, সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ এবং অনন্ত এসব শ্রুতিবাক্য (**উপ**নিষদসমূহের বাক্য) স্পষ্টতই সবিশেষপর (ব্রহ্মের সবিশেষ রূপের ইঙ্গিত বহ)। **কারণ** এসব শব্দ বিশেষ্য সূচক।

ব্রহ্মের লীলা দ্বিবিধ ঃ (i) মায়িকা-অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি এবং (ii) **স্বরূপ-শক্তিময়** শ্রী বিগ্রহ এবং হাস্য-বিলাসাদি। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ হল **চিৎ-ঐশ্বর্য**, পরিপূর্ণ, অনুর্ধ্ব সমান (চৈ. চ. আদি ৭/১১১)।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রুতিতে (উপনিষদে) ব্রহ্ম সম্পর্কে নির্বিশেষপর (অর্থাৎ তিনি নিরাকার) বাক্যও আছে। এর গতি কি হবে? এর উত্তরে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু **বললেন**–শ্রুতি যে যে স্থানে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিরাকার ইত্যাদি বলেছে সে স্থলে প্রাকৃত (**জড়**) গুণসমুহের পরিবর্তে অপ্রাকৃত (চিন্ময়) গুণসমূহের তাৎপর্য বুঝতে হবে (**চৈ.চ. মধ্য ৬/১৪১**)। এর কারণ হল এই যে শ্রী ভগবানের সবিশেষতত্ব নির্ণায়ক **তৈত্তরীয়** উপনিষদে বলা হয়েছে জীব ও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে ব্রহ্মই অপাদান, কারণ ও অধিকারণ কারক হিসাবে অধিষ্ঠিত আছেন (চৈ. চ. মধ্য ৬/১৪৪)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকেও ভগবানের সবিশেষ রূপের যথেষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। **হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের** (বৈষ্ণবতন্ত্র -এতে মূর্তি পূজার বিধি আছে) অনুসরণে বলা যায় নির্বিশেষপরা শ্রুতি থেকে সবিশেষপরা শ্রুতির গুরুত্ব বেশী সমর্থন লাভ করেছে।

(২) দ্বিতীয়ত ঃ মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, শ্রী গীতা, বিষ্ণুপুরান ইত্যাদি গ্রন্থে পরব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ শক্তির বৈচিত্রের কথা স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি হল প্রধান ঃ (i) স্বরূপশক্তি (হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ) (ii) তটস্থা জীবশক্তি (নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যবদ্ধ) এবং (iii) বহিরঙ্গা মায়া শক্তি (বিশ্ব সৃষ্টি-স্থিতি ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত শক্তি)। শ্রী পাদ্ শঙ্করাচার্য শক্তির অস্তিত্ব মেনে নিলেও শক্তির বৈচিত্র মানেন নাই। মহাপ্রভু শক্তি এবং তার বৈচিত্র স্বীকার করেছেন (চৈ. চ. মধ্য ৬/১৫৩-১৬১)।

(৩) তৃতীয়ত ঃ শ্রী রামানুজ সহ অপরাপর আচার্যগণ ভগবানের শ্রী বিগ্রহের নিত্যতা স্বীকার করলেও শঙ্করাচার্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের মুখ্যত্ব (প্রাধান্য) ও জ্ঞেয়ত্ব (যা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব বা জানা যায়) এবং সবিশেষ বা মায়া কবলিত (মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন

বা আচ্ছাদিত) ব্রহ্মের গৌণত্ব ও উপাস্যত্ব স্থাপন করেন। শ্রী মন্ মহাপ্রভু কিন্তু শ্রুতি-প্রমান মূলে (বেদ ও উপনিষদের ভিত্তিতে) পরতত্ত্বকে (শ্রী ভগবান সম্পর্কিত তত্ত্ব) সৎ, চিৎ ও আনন্দময় এবং তাঁর শ্রী বিগ্রহ, ধাম, লীলা ও পরিকরগণকে (পার্ষদ বা শুদ্ধ ভক্ত) তাঁরই স্বরূপ শক্তির বিলাস বলে স্থাপন বা প্রমান করেন (চৈ.চ. মধ্য ৩/৩৮-৪০; ঐ ২০/৩৫-৪০)।

(৪) চতুর্থত ঃ শ্রী শঙ্কারাচার্য মায়ার বশীভূত জীবকে মায়াধীন (মায়ার অধীন) ব্রহ্মের সাথে অভেদ কল্পনা করেছেন বা তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। শ্রী মন্ মহাপ্রভু এই বক্তব্য (মত) নিরসন বা কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন (চৈ. চ. মধ্য ৬/১৬২)।

(৫) পঞ্চমত ঃ শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর ব্রহ্মসূত্রে পরিনামবাদ (যে মতবাদে ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং তিনিই আবার সব কিছুর উৎস বলে ধরা হয়) স্থাপন করেন। শঙ্করাচার্য নিজের কল্পনার উপর ভিত্তি করে বিবর্ত্তবাদ (যে মতবাদে বলা হয় ব্রহ্মই নিজের মায়া অবলম্বনে মিথ্যা জগতের আকারে পরিনত হন/হয়েছেন) স্থাপন করত ব্যাসকেও ভ্রান্ত বলেছেন। শ্রী মন্ মহাপ্রভু এই বিবর্ত্তবাদকে কঠোরভাবে খণ্ডন/বাতিল করে দিয়েছেন (চৈ. চ. আদি ৭/১২১-১২৭ মধ্য ৬/১৭০-১৭২)।

(৬) ষষ্ঠত ঃ শঙ্করাচার্য **"তত্ত্বমসি"** (এর সাধারন অর্থ তুমিও সেই রূপ) শব্দের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অবস্থা নির্দেশ করেন। কিন্তু শ্রী মন্ মহাপ্রভু বলেন যে এটি বেদের একদেশ মাত্র। বস্তুত পক্ষে প্রনবই (ওঁম্) মহাবাক্য, বেদের নিদান, ঈশ্বরের স্বরূপ। প্রনব পূর্বই বিশ্ব সৃষ্টি হয় (চৈ. চ. আদি ৭/১২৮-১৩০)। বস্তুতঃ এই মায়াবাদী ভাষ্যকে মহাপ্রভু বৌদ্ধ মতবাদ অপেক্ষাত্ত অধিক নিন্দনীয় বলে ধিক্কার দিয়েছেন (চৈ. চ. মধ্য ৬/১৬৮)। এজন্য তিনি বলেছিলেনঃ **"মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ"**।

এখন ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য নির্ণয়ের পন্থা কি তাই বিবেচ্য। সব সম্প্রদায়ের আচার্যগণই নিজ নিজ পক্ষে সিদ্ধান্ত করে স্ব স্ব মত স্থাপন করেছেন। কিন্তু শ্রী মন্ মহাপ্রভু বজ্রকণ্ঠে ঘোষনা করলেন যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ -শ্রী মদ্ ভাগবতই (চৈ. চ. মধ্য ২৫/৯৫-৯৮) শ্রেষ্ঠ।

'চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥
সেই সূত্রে যেই ঋক্ -বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক, উপনিষৎ কহে একমত॥

সুতরাং শ্রী মদ্ ভাগবতই প্রমাণ চূড়ামনি। এজন্য দেখা যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু দেবানন্দ পন্ডিতকে লক্ষ্য করে সবাইকে শ্রী মদ্ ভাগবত অধ্যয়নের উপদেশও দিয়েছেন (চৈ ভাগবত অন্ত্য ৩/৫০৫-৫৩৯)।

মহাপ্রভুর একান্তজন শ্রী স্বরূপ দামোদর প্রভুও শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়নের রীতি বর্ণনা করে উপদেশ দিয়েছেন ঃ

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরনে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে সে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

(চৈ চ অন্ত্য ৫/১৩১-১৩২)।

এর তাৎপর্য হল গৌড়ীয় গুরু-গোস্বামীগণের আনুগত্যেই বৈদিক শাস্ত্র প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করা সম্ভব।

৬.৩ গৌড়ীয় দর্শনের সাথে অপরাপর দর্শনের তুলনা

বেদের শিরোভাগ উপনিষদ বলে পরিচিত। উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য ধারাবাহিকভাবে অনেকের পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয় বলে শ্রীল ব্যাসদেব উপনিষদ অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্র নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাই উত্তর মীমাংসা শারীরিক সূত্র বা বেদান্ত দর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার এবং টীকাকার রূপে পরবর্তীকালে অনেক ঋষি এবং মনীষি এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রাবিড়, শঙ্করাচার্য, ঔড়ুলোমী, রুদ্র প্রমুখ প্রধান।

বোধায়ন ঋষির বিচার অবলম্বন করে যামুনাচার্য ও রামানুচার্য প্রমুখ, ঔড়ুলোমীর বিচার অবলম্বন করে নিম্বার্ক, ব্যাসদেবের বিচার অবলম্বন করে শ্রী মধ্বাচার্য এবং রুদ্রের বিচার অবলম্বন করে শ্রী বিষ্ণু স্বামী জগতে বিষ্ণু ভক্তির কথা প্রচার করেছেন।

শ্রী রামানুজের মতে ব্রহ্মের স্থূল শরীর হল জগৎ। এটি ব্রহ্মের ন্যায় সম্পূর্ণ, সমপরিমাণে সত্য এবং রজ্জুসর্পবৎ ভ্রম/ অসত্য নয় (অন্ধকারে দড়িকে সর্প ভেবে ভুল নয়)। ব্রহ্মই সর্বোচ্চ তত্ত্ব। জীব ও জগৎ সত্য হলেও উভয়ই ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্ম ⟹ জীব ⟹ জগৎ এই ক্রম অনুসারে তিনটি তত্ত্ব বিরাজিত। জগৎ জড়ভোগ্য রূপে সর্বনিম্ন স্তরে, জীব চেতন ভোক্তারূপে উচ্চতর এবং ব্রহ্ম সর্ব-নিয়ন্তারূপে উচ্চতম স্তরে অবস্থান করেন। এভাবে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

শ্রী রামানুজ যে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের কথা বলেন সেখানে চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (জগৎ) হল দুটি পৃথক তত্ত্ব। কিন্তু গৌড়ীয় মতে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মেরই

শক্তি। উভয়ই যখন শক্তি তখন শক্তিরূপে তারা একই। অবশ্য অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ভেদে শক্তির ক্রিয়ার (কার্যের) ভিন্নতা আছে। ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের মতে সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের বিশেষণ (গুণ)। শ্রী রামানুজ মতে কেবল জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ। শ্রী রামানুজ শক্তিমান ও শক্তিতে ভেদ স্বীকার করেন। শ্রী জীবপাদ কিন্তু কেবল ভেদ স্বীকার করেন না। শ্রী রামানুজ স্বগতভেদ মানলেও শ্রী জীবপাদ ব্রহ্মের কোন ভেদই স্বীকার করেন না।

(দ্রষ্টব্য ঃ পরমাত্মসন্দর্ভ ⇒ শ্রী শ্যামলাল গোস্বামী।)

শ্রী নিম্বাচার্যের মতে ব্রহ্ম হলেন কারণ। জগৎ হল তাঁর কার্য। ব্রহ্ম শক্তিমান, জীব ও জগৎ তাঁর দুই শক্তি। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাবগত ও ধর্মগত ভেদ রয়েছে। ব্রহ্ম ⇒ চেতন, অস্থুল, অজড় ও নিত্য শুদ্ধ। অপরপক্ষে জগৎ ⇒ অচেতন, স্থুল, জড় এবং অশুদ্ধ। অন্যদিকে কার্য-কারণাত্মক, কারণ—সত্ত্বাময় ও কারণাশ্রয়ী বলে এটি (জগৎ) জগতের কারণ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। জগৎ হল প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রকৃতি ব্রহ্মের অংশ ও শক্তি। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে থাকেন এবং জগৎ সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম বাস্তব পরিণামরূপে দেখা দেন। উভয়ই নিত্য সত্য। নিম্বার্ক মতে জগতের অতিরিক্ত রূপে জীব ও জগৎ থেকে ভিন্ন হলেও আশ্রয়রূপে ব্রহ্ম জীব ও জগৎ থেকে অভিন্ন।

শ্রীল জীবপাদ তার **সর্বসম্বাদিনী** গ্রন্থে নিম্বার্কের উপরোক্ত মতবাদ খন্ডন করেন। তিনি বলেন কার্য (জগৎ) ও কারণের (ভগবান) মধ্যে ভেদাভেদ নেই। কার্য-অবস্থাতেই কার্য এবং কারণ অবস্থাতেই কারণ পরিলক্ষিত হয়। তাই কার্য ও কারণ এবং তার আশ্রয় বস্তু ভিন্ন, এক নয়। স্বাভাবিক ভেদাভেদে ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গুণবৎ জীবের দোষও স্বাভাবিক বলতে হয়। এজন্য ব্রহ্মের সাথে সদোষ (দোষযুক্ত) জীবের আত্মোপদেষ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ।

অন্যদিকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রী বিষ্ণু স্বামী আচার্যের মতে ভগবানের ক্ষেত্রে জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। বিভু চৈতন্যের (ভগবান) সাথে অনুচৈতন্যের (জীব বা আত্মা) যে সেব্য ও সেবক সম্পর্ক আছে তা এদের অদ্বয়জ্ঞানের (অভেদ জ্ঞানের) ব্যাঘাত ঘটায় না। ভগবানের অন্তরঙ্গ/উৎকৃষ্ট শক্তি জীব। আর বহিরঙ্গা শক্তি হল মায়া। এজন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ সবই বস্তু শব্দ-বাচ্য। এগুলো পরম বস্তু (ভগবান) থেকে স্বতন্ত্র নয়।

রুদ্র সম্প্রদায় থেকে খানিকটা বিচ্যুত হয়ে বল্লভাচার্য বলেন জগৎ হল ভগবানের কার্য যা তার মায়া শক্তি দ্বারা রচিত। তবে মায়া জগতের কারণ নয়। ব্রহ্মই জগতের

কারণ রূপে অবিকৃত পরিণাম প্রাপ্ত। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সর্বকারণের কারণ ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে। সৃষ্টির পর সেটি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় বা দেখা যায়।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রী মধ্ব মতে সর্ব শক্তিমান ভগবান ও আশ্রয়রূপ ভক্ত হলেন নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কিন্তু আশ্রয়রূপ জড় বস্তু সেব্য-সেবক সম্বন্ধ রহিত হয়ে তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। মাধ্ব মতে অংশী (ভগবান) কখনো অংশ (জীব) নয়। মুক্ত অবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নভাবে থাকেন। কারণ জীব অনু অংশ হিসাবে ব্রহ্মের সেবক এবং তাঁর কৃপায় মুক্ত হতে পারে।

অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদে কিন্তু গুণ ও গুণিভাবে জীব ও ব্রহ্ম যুগপৎভাবে ভিন্ন এবং অভিন্ন। কিন্তু এই সম্বন্ধ অচিন্ত্যনীয়-অর্থাৎ মানব তর্কের অগোচর। এটি কেবলমাত্র শ্রুতিশাস্ত্রের গম্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে শ্রী জীবপাদ বলেন পরমতত্ত্ব (ভগবান) এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন। সেই শক্তির ক্রমে তিনি সর্বদাই **স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান** রূপে অবস্থান করেন। সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ ও আনন্দময়) বিগ্রহ তাঁর স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী, ও সমস্ত ব্যবহার্য উপকরণ তাঁর স্বরূপ বৈভব। নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই হলেন জীব। মায়া হল প্রধান এবং এই মায়া শক্তি দ্বারা রচিত সমস্ত জড়ীয় স্থুল ও সুক্ষ্ম জগৎই প্রধান শব্দবাচ্য। এই চার প্রকারের প্রকাশ যেমন নিত্য, পরম তত্ত্বের (শ্রী ভগবানের) একত্বও সেরূপ নিত্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে এরূপ বিরুদ্ধ/বিপরীত বিষয়সমূহ কিরূপে যুগপৎভাবে থাকতে পারে ? উত্তর এই যে জীবের বুদ্ধিতে এটি বুঝা অসম্ভব। কারণ জীবের বুদ্ধি সীমিত। পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্যনীয় শক্তিতে তাঁর ঐরূপ চার ধরনের অবস্থান অসম্ভব নয়।

জীব-তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করলেও অপরাপর দর্শনগুলোর (মতবাদ) সাথে গৌড়ীয় দর্শনের সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রতিফলিত হয়।

(i) শ্রী রামানুজ মতে ⟹ জীব হল বিশেষ্যরূপ (নামবাচক বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য, সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ইত্যাদি) পরমাত্মার বিশেষণ রূপ (গুণবাচক) অংশ। জীব ব্রহ্মের শরীর। এজন্যই ক্ষেত্র বিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ। জীব ⟹ নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্ম পরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞার্তা, কর্ত্তা ও ভোক্তা, পরিমাণে অনু, সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত। শ্রেণীভেদে বদ্ধ ও মুক্ত; মুক্ত আবার বদ্ধ-মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত।

(ii) শ্রী মধ্ব মতে ⟹ জীব পরতত্ত্বের মধ্যে (পরম তত্ত্বে) চেতন স্বরূপ, ব্রহ্ম থেকে নিত্য ভিন্ন; সত্য, অনন্ত ও অনুপরিমাণ, শ্রী হরির নিত্য দাস/অনুচর, সত্ব, রজ ও তমঃ ভেদে বদ্ধজীব তিন ধরনের।

(iii) শ্রী নিম্বার্ক মতে ⇒ জীব পরমাত্মার অংশ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অংশ ও অংশীভাব রয়েছে-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব পরমাত্মার স্বাভাবিক ভেদাভেদ (ভেদ + অভেদ = ভেদাভেদ)। জীব জ্ঞানস্বরূপ, দেহের ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, জীব জ্ঞান স্বরূপ হয়েও কর্ত্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, অনু, বহু ও অনন্ত। বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীব দুই ধরনের হয়।

(iv) রুদ্র সম্প্রদায়ের শ্রী বল্লভাচার্যের মতে ⇒ জীব পরব্রহ্মের তিরোভূত আনন্দ অংশ, চিৎ অংশ, নিত্য সত্য, পরিমাণে অনু, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত, উচ্চ-নীচ ভাবাপন্ন, কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা। তবে আনন্দ অংশের তিরোভাব (বিলোপভাব) হেতু মায়ার বশীভূত হয়। ভগবৎ কৃপায় জীবের মধ্যে তিরোভূত আনন্দ অংশের আবির্ভাব হলে জীব ব্রহ্মাত্মক হয়।

(v) গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের মতে ⇒ জীবাত্মাই জীব। মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জীবাত্মা বিশিষ্ট দেহকে উপাচারে জীব বলে। জীবাত্মা পরমাত্মারই শক্তি। জীবতত্ত্ব হল শক্তি এবং কৃষ্ণতত্ত্ব হল শক্তিমান। (চৈ. চ আদি ৭/১১৭)। পরমাত্মার স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির ন্যায় জীব শক্তিও একটি পৃথক শক্তি। তবে জীব তটস্থা শক্তি-স্বরূপ বা মায়া শক্তিতে প্রবিষ্ট নহে। এর দুটি শ্রেণী ঃ একটি ভগবৎমুখী এবং অন্যটি ভগবৎ বিরোধী। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় মায়াকে **অপরা প্রকৃতি** এবং জীবকে **পরা প্রকৃতি** বলা হয়েছে। (গীতা ৭/৪-৫)। পরা প্রকৃতি হল ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি। আর অপরা প্রকৃতি তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি। এদেরকেই যথাক্রমে ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। এজন্য জীব শক্তি পরমাত্মার অংশভূত। জীবাত্মা শ্রী ভগবানের অনু প্রকাশমাত্র, স্বাংশ প্রকাশ নয়। কারণ তার স্বাংশ অংশ স্বরূপত এবং সামর্থ্যের দিক দিয়ে অংশীর (ভগবানের) ন্যায়। কিন্তু অনু অংশ (জীব) স্বরূপে এবং সামর্থে সর্বত্র এবং সর্বদাই ক্ষুদ্রতম। চিৎকন জীবের পরিমাণও অতি সূক্ষ্ণ। মুক্তির পূর্বে এবং পরেও সব সময়ই সে অনু থাকে। মুক্ত জীবও ভগবৎ ভজনাই করেন। ফলে মুক্তির পরও জীব চিৎকনা বা অনুই থাকবে। জীব বহু এবং অনন্ত। জীব ও ব্রহ্মে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। চিৎ-অংশে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হলেও ব্রহ্ম বিভু ও জীব অনু হওয়ায় স্বরূপে ভেদ রয়েছে। আবার জগতের কর্তৃত্ব ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জীব ও ব্রহ্মে সামর্থ্যের দিক থেকেও ভেদ (পার্থক্য) রয়েছে।

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হলেও ভগবৎ বিমুখ হেতু নিত্যবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে এই বদ্ধ আপেক্ষিক। কারণ গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণব প্রসাদে চৈতন্য লাভ করে ভজন করলে জীব মায়ার পাশ থেকে মুক্ত হতে পারে। জীব পূর্ব কর্মানুসারে সৎ বা অসৎ কর্ম

করে। ভগবান তাতে শক্তি দেন মাত্র। জীবের স্বাতন্ত্র্য সীমাবদ্ধ। কারণ সে পূর্ণ-স্বতন্ত্র ভগবানের অনু অংশ মাত্র। এই অনু স্বাতন্ত্র্যই জীবকে ঈশ্বর প্রদত্ত কর্ম শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করায়। নিত্যবদ্ধ জীব ভগবৎ বিমুখ হলেও সাধুসঙ্গের গুনে ভক্তিলাভে চরম-কৃতার্থতা লাভ করতে পারে।

৬.৪ কেন গৌড়ীয় দর্শন শ্রেষ্ঠ ? শ্রী মধ্বাচার্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্যরূপে গণ্য করা হয়। শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন তার **প্রমেয় রত্নাবলী** গ্রন্থে মধ্বমতের সমর্থনে নয়টি প্রমেয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও তিনি **গোবিন্দ ভাষ্য** নামক এক গ্রন্থে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম এই পঞ্চতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে মধ্বমতের প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁর প্রমেয়সমূহ হল ঃ (i) শ্রী হরিই পরমতম বস্তু। (ii) তিনি নিখিল নিগমবেদ্য। (iii) জগত সত্য (iv) ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ও জগতের মধ্যে ভেদ সত্য (v) জীব অনুচৈতন্য, সত্য, নিত্য ও শ্রী কৃষ্ণের দাস (vi) জীবের সাধনগত ভেদ স্বীকার্য (vii) শ্রী কৃষ্ণ-চরণ প্রাপ্তিই মোক্ষ (মুক্তি) (viii) পরাভক্তিই (শুদ্ধ ভক্তি) সাধন এবং (ix) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি হল প্রমাণের মাধ্যম বা উপায়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মত উপরোক্ত নয়টি প্রমেয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ সন্দেহ নেই। তবে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রমেয়ে তাঁর (মহাপ্রভুর) সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষমূলক তারতম্য রয়েছে বলে কিছু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পন্ডিত সিদ্ধান্তে পৌছেন **(দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী হরিদাস দাস, শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, তৃতীয় খন্ড পৃ ১৬২৭)।**

(i) প্রথমতঃ শ্রী মধ্বমতে **'হরি'** শব্দে বৈকুণ্ঠাদি ধামের নায়ককে বুঁঝায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তথা গৌড়ীয় মতে **হরি** শব্দে ব্রজেন্দ্র নন্দনই (শ্রীকৃষ্ণ) বিবেচ্য।

(ii) দ্বিতীয়ত ঃ মধ্বমতে বিষ্ণু থেকে জীব সর্বাবস্থায় ভিন্ন। কিন্তু গৌড়ীয় মতে ঐ ভেদ বা অভেদ অচিন্ত্যনীয়।

(iii) তৃতীয়তঃ মধ্বমতে ভক্তিই মোক্ষের (মুক্তি)হেতু/কারণ। গৌড়ীয় মতে ব্রজগোপীগণ-কল্পিত রম্যা উপাসনাই মোক্ষরূপ প্রেমের হেতু।

শ্রীমন্ মহা প্রভুর দর্শনে সখীভাবের মহিমা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে সখীদের অনুগত হয়েই জীবকে সাধন করতে হবে। তাহলেই তার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে।

"রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী এই রাগানুগা মার্গের ভজনের কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে গোপী অনুগত হয়ে মঞ্জরীভাবের সাধনের যোগ্যতার কথা সমর্থন করেন। সখীর দাসী (অনুগত) হয়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা ⇒ এই হল মঞ্জরীভাবের মূল কথা।

(iv) চতুর্থত ঃ মধ্বমতে বিষ্ণুপদ লাভ মোক্ষ হলেও গৌড়ীয় মতে প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ।

যে কোন ধর্মের প্রধানতঃ তিনটি ভাগ থাকে ঃ দর্শন, অনুষ্ঠান এবং নীতি। দর্শনভাগে পরম তত্ত্বের (ঈশ্বর তত্ত্ব) বিচার, জীব ও জগতের উৎপত্তি, জীব ও জগতের সাথে পরম তত্ত্বের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিচার করা হয়। জীবের পরম প্রাপ্তি বস্তু কি এবং ঐ বস্তু কিভাবে লাভ করতে হয় তার কথাও দর্শনভাগে থাকে। এক কথায় দর্শনভাগে ধর্মের তিনটি অংশ সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠান এবং নীতির ভাগ প্রকৃতপক্ষে অভিধেয় অংশেরই আলোচ্য। এই নীতি হচ্ছে ধর্মের চরিত্র। গৌড়ীয় দর্শনে এসব কিছু যেরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে তা অপর তিনটি বৈষ্ণবীয় দর্শনে নেই।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর **শিক্ষাষ্টক**-এ দর্শনের আলোচ্য তিনটি অঙ্গ– সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বীজ আকারে নিহিত রয়েছে। সম্বন্ধ হল পরম তত্ত্ব বা ভগবৎ তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বের সাথে জীব ও জগতের সম্বন্ধের বিচার। অভিধেয় হল পরম তত্ত্বকে (ভগবানকে) লাভের উপায় এবং প্রয়োজন হল শেষ প্রাপ্তি বা পুরুষার্থ। **"চৈতন্য ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ হলেন সম্বন্ধের বিষয়। অভিধেয় হল ভক্তি এবং প্রয়োজন হল ধর্ম- অর্থ- কাম ও মোক্ষের অতিরিক্ত পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেম'। শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলিতে সেই বিশাল দর্শনই অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।" (দ্রষ্টব্য ঃ অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ⇒ শ্রী চৈতন্য ধর্মের স্বরূপ, রূপান্তর ও সংস্কার পৃঃ ২৮)।**

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতে নাম ও নামী অভেদ – অর্থাৎ কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণ দুই-ই সমান। তাই কৃষ্ণই পরমজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তাঁর অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি। জীব ও জগৎ এই শক্তিরই প্রকাশ। জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। তিনি কৃপাময়। পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম প্রেমময়। তিনি শুধু ব্রজ গোপীদের প্রাণনাথ নন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের প্রাণনাথ। সমন্ধ তত্ত্ব সম্পর্কে এ হল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মত। পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ এবং বৈষ্ণব ধর্মের সম্বন্ধ তত্ত্ব।

জীব তার প্রাপ্য বস্তুকে (ভগবানকে) বুঝতে পারলে ঐ বস্তু প্রাপ্তির উপায়কে অভিধেয় বলা হয়। গৌড়ীয় দর্শনে অভিধেয় হল কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। জ্ঞান, কর্ম

ইত্যাদি মুক্তি লাভের অন্যতম উপায় হলেও এই দর্শনে কৃষ্ণ প্রেমকেই সর্ব প্রধান অভিধেয় (উপায়) বলা হয়েছে। তবে পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ জীবকে কৃপা বিতরণের জন্য উন্মুখ হলেও জীব প্রায়শঃ ঐ কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। এর মূল কারণ হল জীব মায়ায় আবদ্ধ থাকে। জীব যে পরিমাণে মায়াবদ্ধ সেই পরিমাণে কৃষ্ণ বিমুখ থাকে। এটিই ভক্তিলাভের প্রধান বা মূল বাধা। এজন্য গৌড়ীয় দর্শনমতে কৃষ্ণ প্রেমের প্রথম সোপান বা পদক্ষেপ হল নাম কীর্ত্তন ও নাম শ্রবন। এর ফলে একদিন জীবের অন্তরে কৃষ্ণ প্রেমের বা ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। এভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং সবশেষে কান্তাভাবে এর শেষ প্রাপ্তি হয়।

(v) পঞ্চমত ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ মধ্বমতে গৃহীত হলেও গৌড়ীয় মতে কিন্তু শব্দ প্রমাণ বেদ বা তার স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতপুরানই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

শ্রী রামানুজ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অনুগত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমার্গ ভাগবত সম্প্রদায় সম্মত। রামানুজ শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদের (বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পাঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করেন। তারপর থেকে এর উন্নতি হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ন্যায় জগতকে কোন অমৃতময় সিদ্ধান্ত দিতে সমর্থ হয় নাই। মধ্বাচার্যের মতকে প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায় বলা চলে, তবে তাও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করতে সমর্থ হয় নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যোগ্য নেতৃত্বের দরুন গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনের পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে অপরাপর মতগুলো নির্মল আকাশে তারকার মত বহুলাংশে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এজন্য পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবতের গতি শেষ পর্যন্ত সাগরে নদীর গতির ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়েই ন্যস্ত হয়। তারপর গৌড়ীয় সম্প্রদায় ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতকেই আশ্রয় করে তাঁদের ভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁরা পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন (**দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল রাজেন্দ্র লাল ঘোষ ⇒ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ**)।

স্বয়ং মহাপ্রভু নিজে বেদান্ত সূত্রের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। কারণ তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম এবং যথার্থ ভাষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিঁনি ব্রহ্মসূত্রের অপর যে কোন ভাষ্যকেই অর্বাচীন এবং কল্পনাপ্রসূত বিবেচনা করে সেগুলোর বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষনা করেছিলেন। তার প্রতিফলন আমরা শ্রী বাসুদেব সার্বভৌম এবং শ্রী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সাথে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মধ্যেই দেখতে পাই। তিনি যে বেদান্ত সূত্রের অভিনব ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন তা তৎকালীন সময়ের সমস্ত পন্ডিত মেনে নিতে বাধ্য হন এবং তারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরনে আত্মসমর্পনও করেছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ

সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামীসহ অপরাপর বৈষ্ণব আচার্যগণ তাদের গ্রন্থ ও প্রচারে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। তবে এদের মধ্যে শ্রীপাদ জীব গোস্বামীই অগ্রগণ্য ছিলেন বলা যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামী মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ পুরাপুরি স্বীকার করেন নাই। রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদও তাঁর অভিমত নয়। অন্যদিকে নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ কিছুটা স্বীকার করেও নিজের গ্রন্থ **ক্রমসন্দর্ভে ও ষট সন্দর্ভে** এবং বিশেষভাবে **সর্বসম্বাদিনীতে** গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদকে আরোও দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছেন।

শ্রী হরিভক্তি বিলাস এবং **ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে** গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈধ ভক্তির উপাসনা-প্রণালী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ব্রজরসের উপাসনাই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য (প্রধান) উপাসনা। এই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা জ্ঞান সাধনের উপরেও প্রেমভক্তি-দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রেম ভক্তিকেই লীলা রসময় ও আনন্দ-মাধুর্যময় শ্রী শ্রী গৌর গোবিন্দের উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে নির্দেশ করেছেন।

শ্রী ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে শ্রী ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। তাই ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নতুন কিছু নয়, অবৈদিকও নয়। বৈদিক সম্প্রদায় বিশেষই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। স্বয়ং ভগবান শ্রী গোবিন্দ যে সম্প্রদায়ের আরাধ্য, তার বিশেষ আবির্ভাব শ্রী গৌরাঙ্গ যে সম্প্রদায়ের প্রাণ, অনাদি বেদ থেকে যার আবির্ভাব, ব্যাস-নারদ-শুকদেব প্রমুখ পরমহংস যে সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ যার পথ প্রদর্শক এবং জগৎপুজ্য শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামীগণ যে সম্প্রদায়ের আচার্য সেই সম্প্রদায়ের উৎকর্ষতা স্বতঃসিদ্ধ বলা যায়।

আবার শ্রী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রী কৃষ্ণ সেবায় শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মাধুর্যরসের কথা স্বীকৃত। এর মধ্যে আবার মাধুর্যরসকেই সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। মধুর রস গোপী বা কান্তাগণের কথা। কান্তাগণের মধ্যে আবার কান্তা শিরোমণি শ্রী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধিকার কথা আরও চমৎকার। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে আত্ম বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে ছুটেন, কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যে যেমন অবস্থায় থাকেন ঠিক সে অবস্থায় উন্মাদিনী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষনে ছুটেন।

শ্রী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতি রাধার অষ্টদিকে প্রধান অষ্টসখী থাকেন। তিনি যুগপৎ অষ্টসখীর অষ্টভাবে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে রসের রসিক, যে রতির বিষয়ক–অর্থাৎ কৃষ্ণ যখন যা চান, সে সব ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণের

ইচ্ছায় পূর্তময়ী হয়ে তিনি অনন্তকাল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবা-রসে নিমগ্ন থাকেন।

পূর্বে শ্রী নিম্বার্ক আচার্য ও শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ শ্রী রাধা কৃষ্ণের যেরূপ সেবা প্রণালীর কথা বলেছিলেন তাতে শ্রীমতির মহিমা তত সমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁরা শ্রী রাধাকৃষ্ণের নৈশলীলা মাত্র বর্ণনা করেছেন। মাধ্যাহ্নিক (অপরাহ্ন) লীলায় যাঁদের আদৌ প্রবেশাধিকার ছিল না তাঁদের কাছেই শ্রী রাধাকৃষ্ণের ঐরূপ নৈশ লীলার কথা সমাদৃত হয়েছিল।

শ্রী বৃন্দাবন ভগবানের নৈশ বিহারস্থলী এবং শ্রীরাধাকুন্ড তাঁর মধ্যাহ্ন বিহারস্থলী। কুন্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম সেবিকা শ্রী রাধিকার নিজগণের (প্রধান অষ্ট সখীগণের) একচেটিয়া অধিকার। চন্দ্রাবলী প্রমুখ পরকীয়া বিচারে অবস্থিত হলেও এবং মুখ্য গোপী মধ্যে পরিগণিত হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাদের বঞ্চিত করে শ্রী রাধার সাথে মিলনের জন্য রাধাকুন্ডের তীরে আগমণ করেন।

অষ্ট প্রকার নায়িকার ভাব যুগপৎ শ্রী রাধার মধ্যে বিদ্যমান। শ্রী বৃন্দাবনের রাসস্থলী (রাস লীলার স্থান) এবং পরাসৌলির রাসস্থলী (গিরিগোবর্দ্ধন) উভয় স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে পরিত্যাগ করে শ্রী রাধার সাথে সঙ্গলাভের জন্য উন্মুখ হন। যেমন গিরিগোবর্দ্ধনের রাসস্থলীর (পরাসৌলির উদাহরণ) নিকট পৈঠা গ্রামে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করে তাদের বঞ্চনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতি রাধা সেখানে উপস্থিত হলে আর চতুর্ভুজ রক্ষা করতে পারেন নি।

শ্রী বৃন্দাবনের নৈশ বিহারের কথা যা শ্রী নিম্বার্ক কীর্ত্তন করেছেন, তা থেকে শ্রী গৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তার অনুগতগণের বর্ণিত শ্রী রাধাকৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিক লীলা-মাধুর্যের উৎকর্ষের কথা তারতম্য বিচারে অনেক উন্নত।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিচার থেকে গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের বিচার-আশ্রিত বাদের উৎকর্ষতা বেশি। শ্রী গৌর সুন্দরের পূর্বে গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ড তীরের কুঞ্জবনের নিকটবর্তী চিন্ময় কল্পতরুর তলে নব নব অপূর্ব বিহারের কথা পূর্বতন কোন আচার্য বা উপাসক সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করতে সমর্থ হন নাই। তাঁরা কেউ কেউ রাসস্থলীর লীলার কথা অবগত ছিলেন মাত্র। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানু নন্দিনী কি প্রকারে কৃষ্ণ সেবার অধিকার লাভ করে থাকেন পূর্বে কারও ঐ রসমাধুর্যের ও সৌন্দর্যের কথা জানা ছিল না এবং সেবারও অধিকার ছিল না। এরূপ লীলায় প্রবেশের সৌভাগ্যের অধিকার মধুর রস সেবী শ্রী গৌরজন ব্যতীত অন্যের যে লভ্য নয়, একথা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কারোও জানা নেই।

[বিঃ দ্রঃ মধ্যাহ্নকালে শ্রী রাধাকৃষ্ণ রাধাকুন্ডের তীরে দোলা-খেলা, অরন্যবিহার, বাঁশী অপহরন, মধুপান, ও সূর্য্যপুজাদি লীলা করতেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এসব লীলা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।]

শ্রী বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্যে লীলাশুক শ্রী বিল্বমঙ্গল তার **কৃষ্ণকর্ণামৃত** গ্রন্থে মধুর রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করলেও তাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত বৃষভানুনন্দিনীর মাধ্যাহ্নিক লীলার পরম চমৎকারিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। এমনকি শ্রী জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থেও এর কীর্ত্তন করা হয় নাই।

রাসস্থলী তিনটি ঃ

(i) যামুন-রাস ⇒ বৃন্দাবনের ধীর সমীরে।

(ii) পরাসৈলিতে রাস ⇒ গিরিগোবর্দ্ধনে।

(iii) রাধাকুন্ডে রাস।

রাধাকুন্ড থেকে শ্রীকৃষ্ণের চলে যাবার কথা নেই। শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলী এবং পরাসৈলির রাসস্থলী (রাসলীলার স্থান) উভয় স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে পরিত্যাগ করে শ্রী রাধার সঙ্গলাভের জন্য প্রলুব্ধ হন। চন্দ্রা, শৈব্যা, ভদ্রা প্রমুখ (চন্দ্রাবলীর সখীগণ) শ্রী রাধাকুন্ডে প্রবেশ করতে পারেন না। বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, রামানুজ প্রমুখ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রী রাধাকুন্ডের ভজনরহস্যে প্রবেশাধিকার নেই।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকেও গৌড়ীয় দর্শনকে অপরাপর দর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. **শ্রীল রাজেন্দ্র লাল ঘোষ ঃ** আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ।
২. **শ্রী আনন্দগিরি ঃ** শঙ্কর দিগ্‌বিজয়।
৩. **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ঃ** প্রমেয় রত্নাবলী।
৪. **শ্রী হরিদাস দাস ঃ** শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান। প্রথম খন্ড, তৃতীয় খন্ড এবং চতুর্থ খন্ড।
৫. **শ্রী রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ ঃ** শ্রী বৈষ্ণব।
৬. **সৎ স্বরূপ দাস গোস্বামী ঃ** Elements of Vedic Thought and Culture.
৭. **শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ঃ** বৈষ্ণবাচার্য শ্রী মধ্ব।
৮. **শ্রী বিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী (শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)ঃ** বঙ্গে সামাজিকতা (বর্ণ ও ধর্মগত সমাজ)।
৯. **শ্রী হরিকৃপা দাস (ত্রিডন্ডী ভিক্ষু শ্রী ভক্তিজীবন হরিজন) ঃ** পরম গুরুদেব শ্রী প্রভুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
১০. **শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ ঃ** মহাভারত (দ্বিতীয় খন্ড)।

লেখক পরিচিতি

শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন নিজ গ্রামের রাজদিয়া অভয় উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) হিসাবে কাজ করেছেন। অর্থনীতিতে বি. এস এস (সম্মান) এবং এম. এস.এস শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেছেন ১৫টি।

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পণ" এবং ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হরেকৃষ্ণ সমাচার" এবং ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকায় এ পর্যন্ত তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। হরেকৃষ্ণ সমাচার এবং অমৃতের সন্ধানে-এ দু'টি ধর্মীয় পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক।

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ।